ছোটদের সেরা মাসিকপত্র
জুন
সন্দেশ
২০০৪
গ্রহে-গ্রহান্তরে

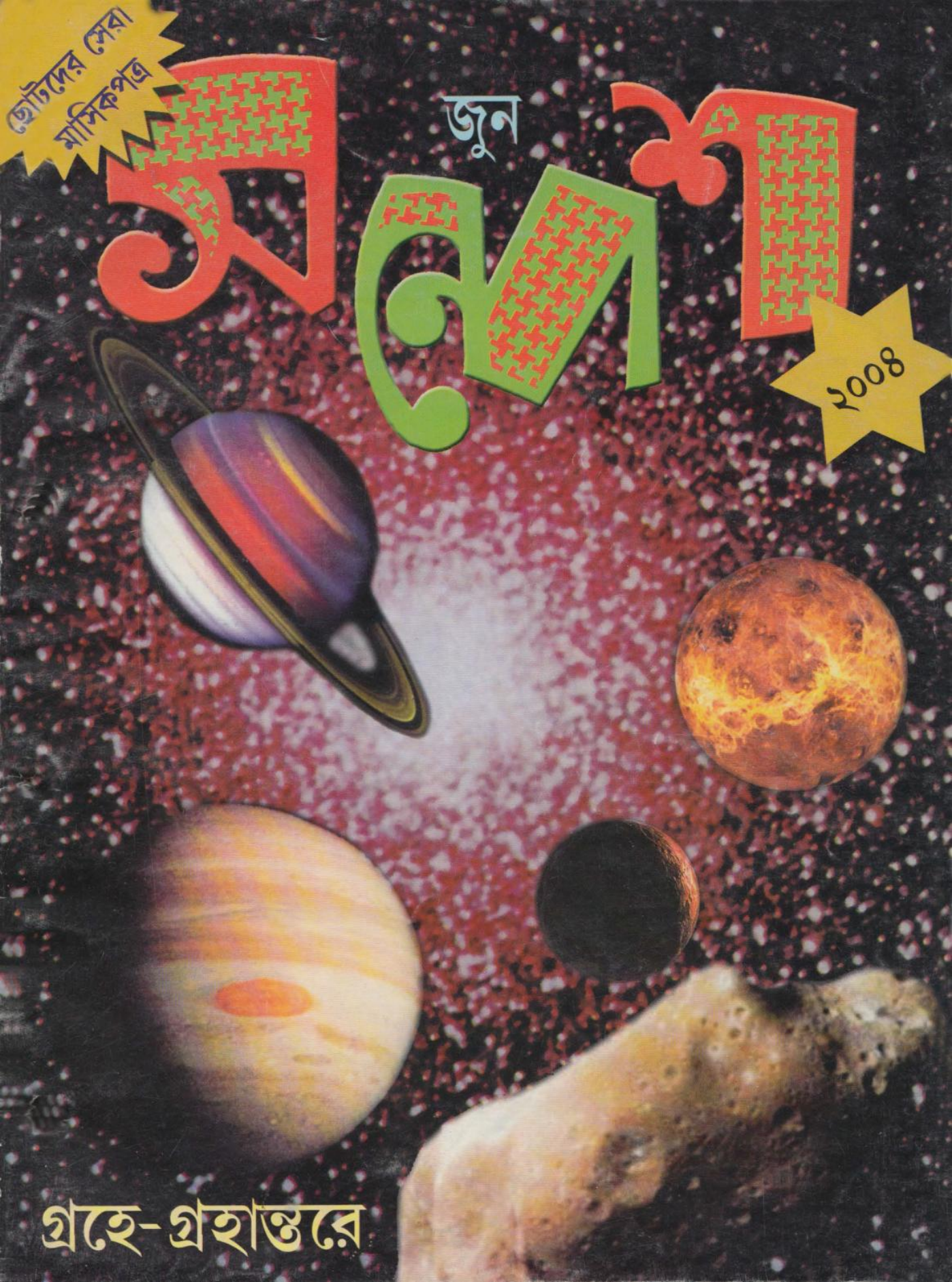

Hard Copy, Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

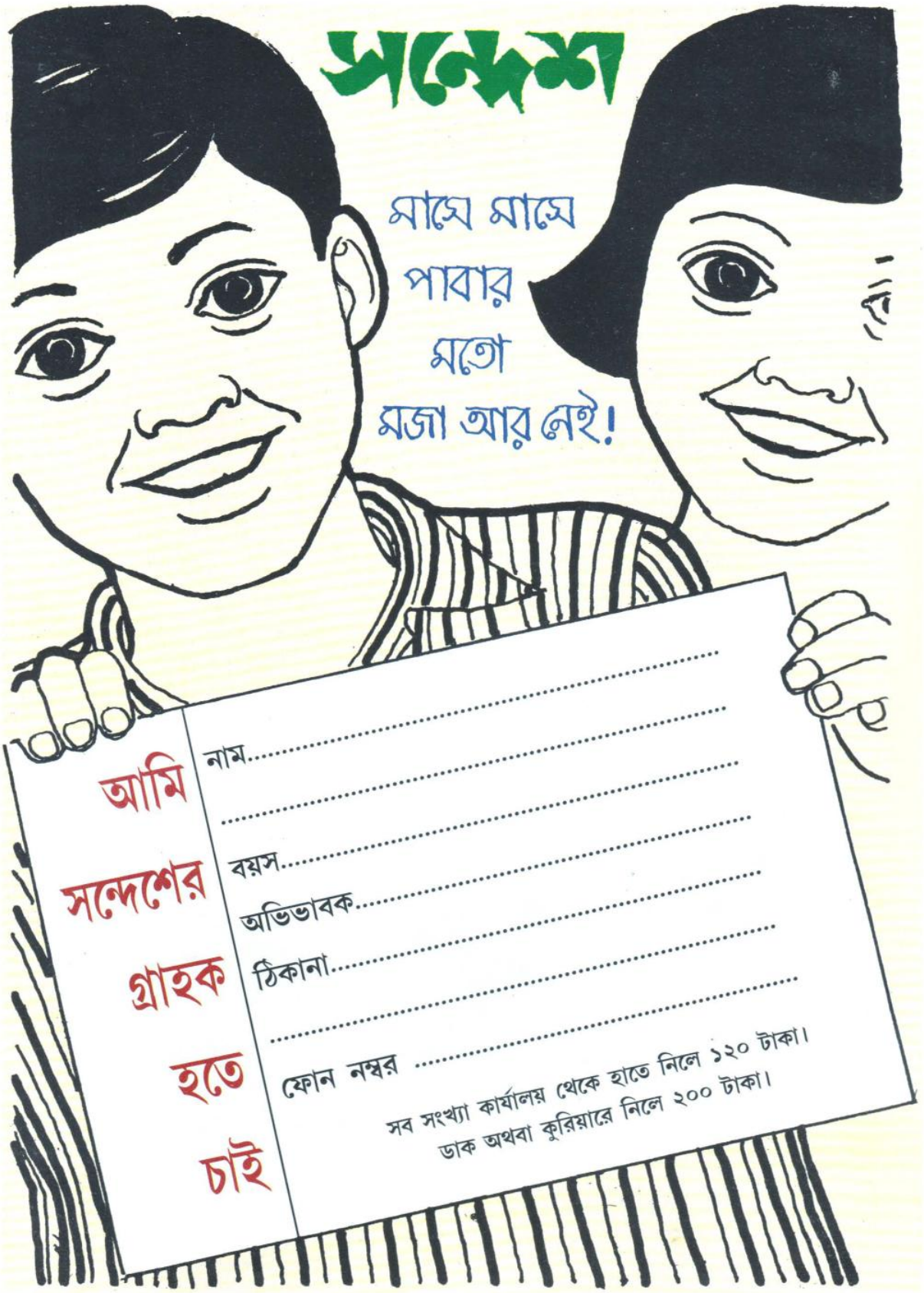

সন্দেশ
মাসে মাসে
পাবার
মতো
মজা আর নেই!
আমি
সন্দেশের
গ্রাহক
হতে
চাই
নাম
বয়স
অভিভাবক
ঠিকানা
ফোন নম্বর
সব সংখ্যা কার্যালয় থেকে হাতে নিলে ১২০ টাকা।
ডাক অথবা কুরিয়ারে নিলে ২০০ টাকা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ● ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ ৪৩ ● জুন ২০০৪ ● জ্যৈষ্ঠ ১৪১১

বিশেষ আকর্ষণ

মহাকাশে গ্যালাক্সি : শঙ্কর কুমার নাথ ৪
স্বর্গীয় গোলক : অপরাজিত বসু ৭
চেনা-অচেনা সৌরজগৎ : প্রসাদরঞ্জন রায় ৯
শতাব্দীর জিজ্ঞাসা মঙ্গলে প্রাণ? অলোকমাহন চট্টোপাধ্যায় ১২
চিত্রনাট্য : জয় বাবা ফেলুনাথ (ধারাবাহিক) ৬৪

পুরোনো সন্দেশ থেকে

খেলোয়ার : সুনির্ম্মল বসু ৩৭

ধারাবাহিক উপন্যাস

যমুনাবতী : রাজা রায় ৩২

গল্প

আলাথ্ কাড্ : সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় ১৬
ন ভূতো : রাকা দাশগুপ্ত ২৪
বন্ধু : দেবাশীষ ঘোষ ৪৬

কবিতা

সদ্যোজাত : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩
বাতাসের বড়াই : শবনম নাদিয়া ৩৮

প্রবন্ধ

সন্দেশে সন্দেশ সন্দেশ : রেবতীভূষণ ঘোষ ৪০
নাটের গুরু : ফতেমোল্লা ৪৩
শোলা শিল্প : পৃথা বল ৫৬

কার্টুন

রান্নাঘরের গল্প : সর্বজিৎ সেন ২

কমিক্স

কমান্ডার বোস : গৌতম কর্মকার (ধারাবাহিক) ২৮
নন্দ গুপীর মন্দ কপাল : দিলীপ দাস ৫০

খেলা

৩০০ এবং ৪০০ : বল বয় ৬০
২০০৭ বিশ্বকাপের জন্য স্বপ্ন দেখাই যায় : সব্যসাচী সরকার ৬২

বিভাগীয়

অঙ্কের মজা : স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী ৪৯
শব্দ-শরীর : বর্ণবণিক ৪৯
পাঁচ কথার প্যাঁচ : শুভেন্দু দাশমুন্সী ৫২
প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর : জীবন সর্দার, অয়ন ঘোষ ৫৪
কুইজ : সুগত রায়, বিনীতা ঘোষ ৭১
ধাঁধা ৭২

হাত পাকাবার আসর ৫৭

লেখা : সুদীপ্ত নাগ, সুশ্রুত চক্রবর্তী, অভিষেক রায়
ছবি : অনির্বাণ ত্রিবেদী, সাগ্নিক কুমার সেন

সম্পাদক
সন্দীপ রায়

যুগ্ম সম্পাদক
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসাদরঞ্জন রায়

নির্বাহী সম্পাদক : সুমিতা সামন্ত

শিল্পনির্দেশনা : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিশেষ সহায়তায় : দেবাশিস সেন

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯৪/২/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড (ফেডারেশন হল তৃতীয় তল), কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত
স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

রান্নাঘরের গল্প

সর্বজিৎ সেন

সদ্যোজাত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ছাই আর ধুলো জড়ো করে নিয়ে
ছিটিয়ে দিতেই হয়ে গেল তারা,
শাল-সেগুনের ঈষৎ উপরে
আর্দ্র নয়নে তাকায় বেচারা।

ইচ্ছে করলে তাকে অনায়াসে
আঁকশি ছাড়াই পেড়ে আনা যায়,
আমার হাতেই জন্ম নিয়েছে
এই কথা জেনে কৃতজ্ঞ হাসে।

ভীরু ভরসায় যাপন করছে
আজকে প্রথম এ জন্মদিন,
সৌরজগতে সবচেয়ে নিচু
রাঙা এই তারা, দারুণ নবীন!

তাকে দ্যাখেন নি কোপার্নিকাস
এ পর্যন্ত তার কোনো নাম
প্রণীত হয়নি, তবু তাকে নিয়ে
আরেক স্তবক যোগ করলাম।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

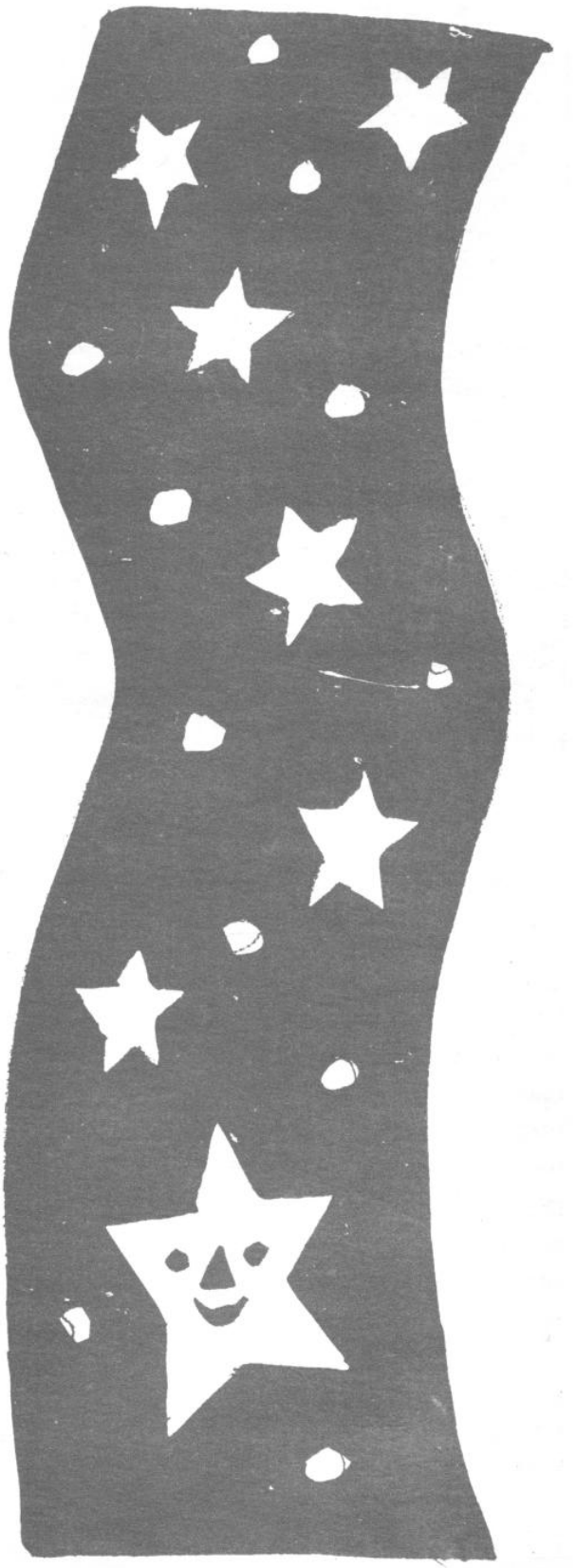

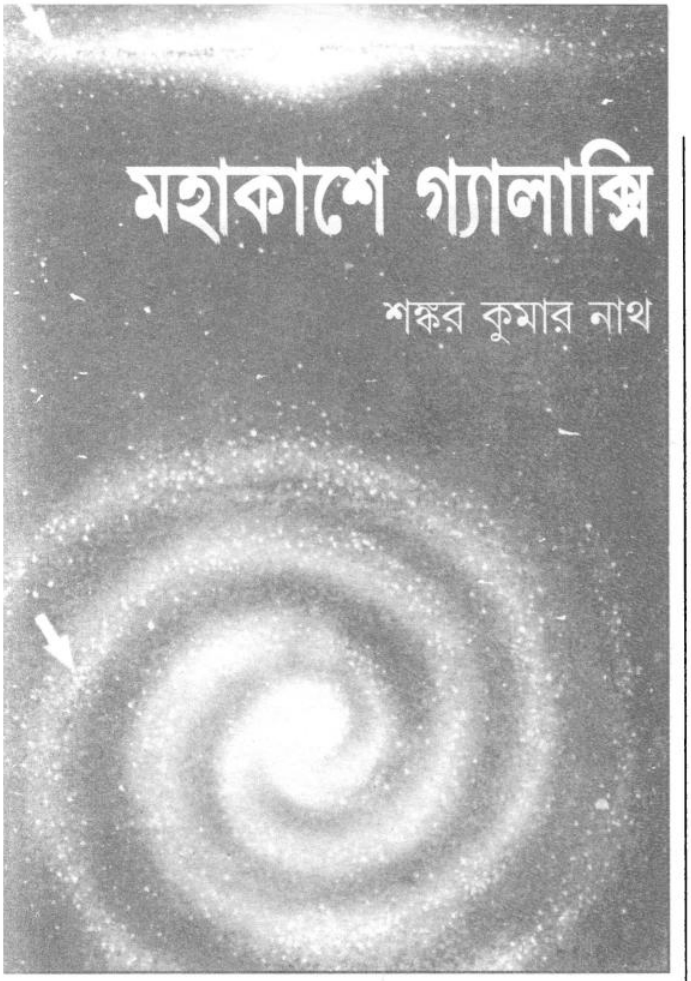

আকাশগঙ্গা, তিরচিহ্নিত স্থানে সৌরজগতের অবস্থান

তোমরা যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী, তারা জেনে রেখো, খালি চোখে আকাশচর্চার মতো এমন অনাবিল মজা আর কিছুতে পাওয়া শক্ত। রাতের নির্মল আকাশের দিকে যখন তোমরা একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে থাকবে, তখন দেখবে, তারায় তারায় ভরে আছে আকাশটা। খালি চোখেই কিন্তু সমগ্র আকাশটা দেখা যায় এবং তার সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলকেও একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডলে সত্যিই সাতটি তারা আছে কিনা—তাকে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো দেখতে কিনা, অথবা কালপুরুষের আকারটি সত্যিই একজন শিকারীর মতো কিনা, এ সবই জানতে পারা যাবে দূরবিন দিয়ে নয়, কেবলমাত্র খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণ করলে।

আমরা সেই রহস্য-সন্ধানে এগোবার চেষ্টা করি। রহস্য উদ্‌ঘাটনে আমাদের তাকাতে হবে বর্ষার পর শরৎকালের আকাশে। সবচেয়ে ভালো হয়, ঝম্‌ঝম্ করে দু'চার পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর যে-আকাশ, সেখানে যদি আমরা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। ওই সময়টায়ই তো ঘন কালো আকাশে ফুটে ওঠে একটা চওড়া বেল্টের মত সাদা ছাপ, যা আকাশের একদিক দিয়ে শুরু হয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। এই বেল্টটি কোথাও কোথাও ভীষণ উজ্জ্বল, কোথাও আবার অনুজ্জ্বল। এই শুভ্র বেল্টটি তৈরি হয়েছে কোটি কোটি তারার সমষ্টিতে। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, একটা ভালো বাইনোকুলার অথবা ছোট একটা দূরবিন দিয়ে ওই বেল্টের দিকে তাকাও, দেখবে বেশ কিছু তারাকে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, এই শুভ্র বেল্টটিরই নাম আকাশ গঙ্গা বা দুধ গঙ্গা। ইংরেজিতে একে বলা হয় Milky Way। আসলে এটি একটি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র-জগৎ, এর নাম **ছায়াপথ**। এই দেখ, আবার একটা নতুন শব্দ এনে ফেললাম, Galaxy বা নক্ষত্র জগৎ। তাহলে সেটা কী জানা যাক্।

ধরা যাক্ আমাদের জন্য এমন একটা ব্যবস্থা করা হল যে, এই পৃথিবী ছেড়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম অনেক অনেক দূরে, মানে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে এবং সেখান থেকে আমরা পৃথিবীকে দেখার চেষ্টা করলাম। না, পৃথিবীকে মোটেই দেখা যাচ্ছে না। তাহলে সেখানে কী দেখব জান? এক অপূর্ব দৃশ্য। ঘন অন্ধকার আকাশে বিশাল একটা মেঘের মতো, সেটা আবার পেঁচানো চক্রাকার (spiral), যার একটা কেন্দ্র আছে এবং সেখান থেকে সর্পিল চক্রাকার বাহুগুলি বার হয়ে আকাশের কোলে ছড়িয়ে পড়েছে। কেন্দ্রের দিকটা তার মোটা, ঘন এবং উজ্জ্বলতম আর চক্রের ধারগুলি ক্রমশ চ্যাপ্‌টা হয়ে এসেছে। হ্যাঁ, দশ হাজার কোটি তারা দিয়ে এটি তৈরি, সঙ্গে অবশ্য ফাউ হিসাবে কিছু গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা ইত্যাদির দেখাও মেলে বটে। এটাই হল একটা Galaxy বা নক্ষত্রজগৎ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি তৈরি হয়েছে এইরকম কোটি কোটি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগতের সমাহারে।

উপরে বর্ণিত ওই নক্ষত্রজগতটিই হল আমাদের নক্ষত্রজগৎ, অর্থাৎ সূর্য তার পরিবারবর্গ নিয়ে পড়ে আছে ওই প্রকাণ্ড নক্ষত্রজগতের একদিকে। আসলে এই নক্ষত্রজগতে সূর্য নিতান্তই এক ছেলেমানুষ তারা। ওর চেয়েও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব তারা উজ্জ্বলতায় ওর চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি এমন তারার আকছারই দেখা মেলে। ঠিক ধরেছ, আমাদের এই নক্ষত্রজগতের নামই হল ছায়াপথ, বা আকাশগঙ্গা, বা Milky Way যাই বলো না কেন। আসলে Galaxy কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে, যার অর্থ দুধ। বর্ষা শেষে তোমরা মাঠ থেকে বা ছাদ থেকে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওই শ্বেত-শুভ্র বেল্টটিকে মনে হবে আকাশের গায়ে কেউ বুঝি এক বাটি দুধ ফেলে দিয়েছে, আর সেই

দুধ, নদীর মতো পথ তৈরি করে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে গেছে। কয়েকমাস ধরে লক্ষ্য করলে দেখবে, এই শ্বেত-শুভ্র পটিখানি এঁকে বেঁকে চলেছে উত্তরে ক্যাসিওপিয়া থেকে শুরু হয়ে পার্সিয়ুস, অরিগা, বৃষ, মিথুন, কালপুরুষ হয়ে বৃশ্চিক, ধনু, সর্পমণ্ডল, হংসমণ্ডল হয়ে আবার চলে এসেছে আবার ক্যাসিওপিয়াতে।

আমাদের ছায়াপথের চাক্‌তিটির ব্যাস হল এক লক্ষ আলোকবর্ষ। এর মানে হল চাকতিটির ব্যাসের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছতে সময় লাগে এক লক্ষ বছর। মনে রেখো এক সেকেন্ডে আলো ছুটে যায় তিন লক্ষ কিলোমিটার বা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এবার এই চাকতিটি কতটা পুরু তা জানা যাক। যেহেতু কেন্দ্রের কাছটা মোটা, তাই ওইখানটার দূরত্ব হল কুড়ি হাজার আলোকবর্ষ, আর একেবারে প্রান্তের কাছে সেটা এক হাজার আলোকবর্ষের মতো।

এই বিশালাকার নক্ষত্রজগতের ভিতরে আমরা কোথায় আছি? এই ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে একপাশে সূর্য আমাদের নিয়ে ঘর-সংসার করছে। যেন সমগ্র সৌরজগতটি হল এককণা ধূলি পুরো ইডেনউদ্যানে! শুনলে অবাক হবে, এই সমগ্র চাকতিটি পাক খেয়ে চলেছে তার কেন্দ্রের চারিদিকে। ঘূর্ণনের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৪০ কিমি। সবাই ঘুরছে, দশ হাজার কোটি তারা ঘুরে চলেছে, ঘুরে চলেছে আমাদের সূর্যও—একপাক ঘুরতে সময় লাগে কুড়ি কোটি বছর। সূর্যের জন্ম পাঁচশো কোটি বছর ধরলে, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত সে মাত্র পঁচিশ পাক ঘুরেছে।

একটা চার ইঞ্চি প্রতিফলক দূরবিনে তোমরা যদি চোখ রাখ, তাহলে দেখবে ওই অঞ্চলটায় এত বেশি তারা আর এত নীহারিকার আধিক্য (যেগুলি খালি চোখে দেখা যাচ্ছিল না) যে, তোমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।

তাহলে নীহারিকা (Nebula) কী, সেটাও জেনে নিই। এগুলি আকাশে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মেঘের টুকরোর মতো—কিন্তু মেঘ নয়। এগুলি বেশির ভাগটাই গ্যাসের পিণ্ড এবং সেখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে তারা, বলা যায় তারা তৈরির ফ্যাক্টরি। এগুলির বেশিরভাগই খালি চোখে দৃশ্যমান নয়, দেখতে গেলে দূরবিনের প্রয়োজন হয়। ১৬০৮ সালে দূরবিন আবিষ্কারের পর থেকেই খালিচোখে অদৃশ্য আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি আমাদের চোখের সামনে হাজির হতে লাগল। দূরবিনের ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল, এই অদেখা জ্যোতিষ্কের সংখ্যাও বাড়তে লাগল তত।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের বলব এক সাধক পর্যবেক্ষকের কথা। এঁর নাম চার্লস মেসিয়ার। ইনি একজন ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী। দূরবিনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে এইরকম টুকরো মেঘের মতো জ্যোতিষ্কগুলিকে তিনি তালিকাভুক্ত করলেন ১৭৮৪ সালে। এইভাবে তিনি মোট ১০৩টি জ্যোতিষ্কের নাম ধাম লিখে গেছেন। এগুলিকে তাঁর নামের আদ্যক্ষর এবং তালিকায় কত নম্বরে তার স্থান, সেই অনুযায়ী নামাঙ্কিত করা হল। যেমন M1, M2, M3 ইত্যাদি। অনেক পরে জানা গেল, তাঁর তালিকায় এমন বেশ কিছু জ্যোতিষ্ক আছে, যেগুলি নীহারিকা নয়, একেবারে আস্ত এক একটা Galaxy বা নক্ষত্রজগত (আমাদের ছায়াপথের মতো)। যেমন, M31; এটি আদৌ নীহারিকা নয়, এটি একটি নক্ষত্রজগৎ, নাম **এ্যান্ড্রোমিডা**।

তোমাদের মতো এক ক্ষুদে আকাশপ্রেমী সেদিন আমায় বলছিল, আকাশের মধ্যেই নাকি মহাকাশ লুকিয়ে আছে। কথাটা আমার দারুণ লেগেছে। কেন জান? রাতের আকাশে এমন অনেক অনেক জ্যোতিষ্কই রয়েছে, যেগুলি কিনা আমাদের ছায়াপথের বাইরে থাকে। এমন ছায়াপথ-বহির্ভূত তিনটি জ্যোতিষ্ককে আমরা খালি চোখেই দেখতে পাই। এর মধ্যে একটি আছে উত্তর গোলার্ধের আকাশে আর দুটি আছে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে। উত্তর গোলার্ধের ওই জ্যোতিষ্কটির নাম এ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি বা এ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রজগৎ। আর দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে দুটি নক্ষত্রজগৎ হল বৃহৎ

ম্যাগেলানীয় মেঘ এবং ক্ষুদ্র ম্যাগেলানীয় মেঘ; এ দুটিকে দেখতে গেলে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে যেতে হবে। বৃহৎ ম্যাগেলানীয় মেঘে তারার সংখ্যা প্রায় ৫০০ কোটি আর পৃথিবী থেকে এটি আছে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। ক্ষুদ্র ম্যাগেলানীয় মেঘের মধ্যে তারার সংখ্যা দেড়শো কোটির মতো আর এটিও আমাদের ছায়াপথের বাইরে, পৃথিবী থেকে এক লক্ষ সত্তর হাজার আলোকবর্ষ দূরে। বলতে ভুলে গেছি, এ দু'টির নাম মেঘ হলেও, এরা একেবারেই মেঘ নয়, এরা এক একটি নক্ষত্রজগৎ। ১৫১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সমুদ্র পর্যটক ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে ক্রমশ একমুখী পর্যটন চালিয়ে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে শেষে একই জায়গায় ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন (এই অভিযান প্রমাণ করেছিল পৃথিবী গোল-ই)। তিনি যদিও দেশে ফেরবার আগেই মারা যান, কিন্তু তাঁর ১৮ জন নাবিক তাঁর অসম্পূর্ণ সমুদ্রযাত্রাকে সফল করে দেশে ফিরে এসেছিলেন ১৫২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। সেই ভয়ংকর অথচ মহান প্রথম পৃথিবী পরিক্রমাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের ওই দুই জ্যোতিষ্কর নাম রাখা হয় ম্যাগেলানীয় মেঘ। আর আমরা যারা উত্তর গোলার্ধের বাসিন্দা, তারা কিন্তু নয়নাভিরাম এ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রজগৎকে দু'চোখ ভরে দেখে নেবার চেষ্টা করব, যদিও খালি চোখে তাকে ধূসর মেঘের মতোই লাগে। এই গ্যালাক্সিটি আছে ২০ লক্ষ আলোকবর্ষেরও বেশি দূরে। এটিও আমাদের ছায়াপথের মতো চক্রাকারে সজ্জিত, তবে একটু বড়ো কারণ, এর ব্যাস প্রায় দেড় লক্ষ আলোকবর্ষ। যারা গ্রামে থাক, তারা যদি নির্মল, মেঘমুক্ত, চন্দ্রবিহীন পরিষ্কার আকাশে চোখ রাখ সামান্য উত্তর দিকে, সময়টা হবে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে, তবে ওই এ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রজগতটি তোমাদের সামনে ধরা পড়বে। ক্যাসিওপিয়া (W আকারের) আর পেগাসাসের (চতুর্ভুজ আকারের) মধ্যবর্তী অঞ্চলে পেঁজা তুলোর মতো ধূসর এ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিকে দেখা যায়। একটা বাইনোকুলার বা ছোট একটা দূরবিনে চোখ রেখে দেখ, তাহলে একটু পরিষ্কার হবে। বহুকাল জানা ছিল এটি একটি নীহারিকা। কিন্তু ১৯২৪ সালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসনে অবস্থিত ১০০ ইঞ্চি দূরবিনে এ্যান্ড্রোমিডাকে দেখে প্রথম বললেন যে, এটা নীহারিকা নয়, এটা আস্ত একটা নক্ষত্রজগৎ যা আমাদের ছায়াপথের বাইরে রয়েছে। চার্লস মেসিয়ারের কথা মনে আছে তো? ওঁর তালিকায় তারা নয় এমন জ্যোতিষ্কের সংখ্যা ছিল ১০৩টি। সেই অনুযায়ী এ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির নাম হল M31। ওঁর পরে ১৮৮৮ সালে যোহান ড্রেয়ার-এর New General Catalogue বা NGC আর তারও পরে Index Catalogue বা IC-এর মতো তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা নয় এমন জ্যোতিষ্কের তালিকাভূক্ত সংখ্যা প্রায় ১৩,০০০ বা তারও বেশি। মেসিয়ারের ১০৩টির মধ্যে ৩৪টি রয়েছে আমাদের ছায়াপথের বাইরে; এইরকম কয়েকটির নাম বলা যেতে পারে, M31, M32 (এটি M31 বা এ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির পাশেই রয়েছে), M33, M49. M51, M58 ইত্যাদি। এর মধ্যে অপূর্ব সুন্দর ওই M51 যার নাম ঘূর্ণি নক্ষত্রজগৎ (Whirlpool Galaxy)।

আংটি নীহারিকা (*M-57*)

নীহারিকা বা নক্ষত্রজগতের একটি সংক্ষিপ্ত শ্রেণিবিভাগ করে দিলে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে।

ছায়াপথ-অন্তর্ভূক্ত নীহারিকা দুরকম :

- বিকীর্ণ নীহারিকা (Diffused Nebula),
- গ্রহাকৃতি নীহারিকা (Planetary Nebula),

ছায়াপথ-বহির্ভূত নক্ষত্রজগত তিনরকম :

- কুণ্ডলিত চক্রাকার (Spiral Galaxy, শতকরা ৭৪),
- ডিম্বাকৃতি (Elliptical Galaxy, শতকরা ২৩),
- অনিয়তাকার (Irregular Galaxy, শতকরা ৩)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ছায়াপথ, অন্যান্য নক্ষত্রজগৎ এবং নীহারিকা ইত্যাদি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হল তোমাদের। কিন্তু রহস্যেভরা এই মহাকাশের অধিকাংশই আজও রহস্যাবৃত। আমি জানি, অজানাকে জানবার, অনুভব করবার এক দুর্নিবার আকর্ষণ আছে তোমাদের। আর তার জন্যই নির্মল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে একরাশ প্রশ্ন বুকে নিয়েও তোমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ভালোবেসে ফেলেছ, সন্দেহ নেই।

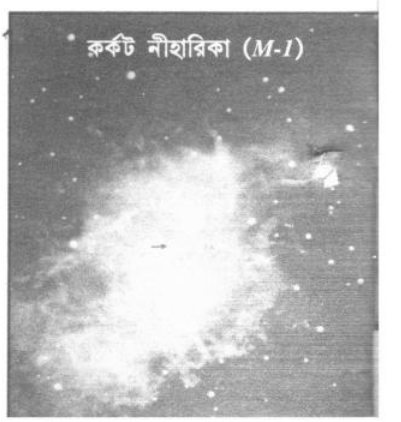
কর্কট নীহারিকা (*M-1*)

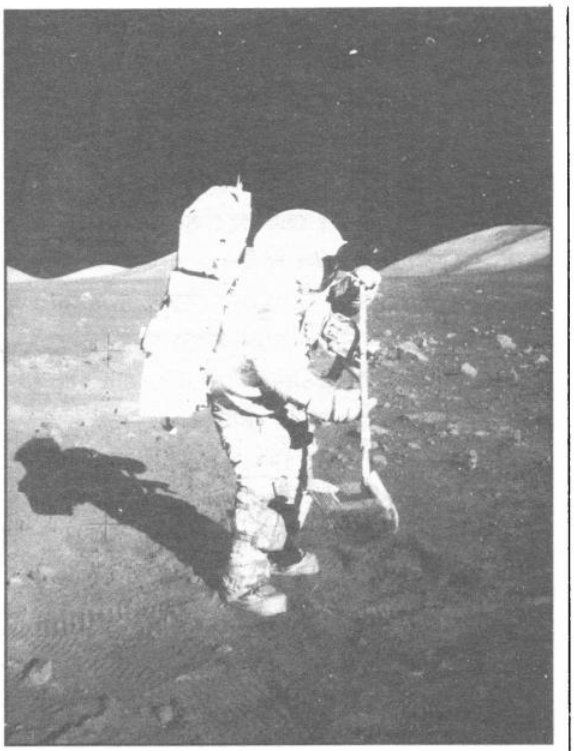

স্বর্গীয় গোলক

অপরাজিত বসু

চাঁদ হল পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ। একাদশ অ্যাপোলোতে চড়ে ১৯৬৯ সালে মানুষ প্রথম চাঁদে পা রেখেছিল। প্রথম চন্দ্র-অবতরণকারী নীল আর্মস্ট্রং প্রায় দু-ঘণ্টা চাঁদে ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে তিনি ও তাঁর সহযোগী এডুইন অলড্রিন অনেক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, প্রায় ২২ কেজি চাঁদের পাথরকে ব্যাগে ভরেছিলেন। আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা ঠেকিয়ে বলেছিলেন— 'একটা মানুষের এই ক্ষুদ্র পদক্ষেপ আসলে মানবসভ্যতার পদক্ষেপ।'

মোট বারোজন অভিযাত্রী চাঁদে নেমেছিলেন। আর্মস্ট্রং যে পাথরগুলি এনেছিলেন তা সারা পৃথিবীতে ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছিল। কলকাতাতেও একটা প্রদর্শনী হয়েছিল। দেখতে সাদা-সাদা টুকরো পাথরগুলি খুব একটা আলাদা বলে মনে হয়নি। পৃথিবীতে এরকম পাথর পাওয়া যায়।

নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহগুলি মহাজাগতিক ধুলো, গ্যাস জড়ো হয়ে হয়ে তৈরি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতি— সবাই ওভাবে হয়েছে। তবে চাঁদকে পৃথিবী একটু অন্যরকমভাবে পেয়েছে— এরকমই ধারণা। চাঁদ অন্যত্র কোথাও তৈরি হওয়ার পর কোনওভাবে পৃথিবীর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে।

চাঁদ একটা নিখুঁত গোলাকৃতি জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ কিছুটা চাপা, চাঁদ সেরকম নয়। চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায়, চারভাগের একভাগ মাত্র। তাই চাঁদের ভর পৃথিবীর তুলনায় কম, প্রায় একাশি ভাগে একভাগ। এ-সব দিয়ে হিসাব করে বলা যায় যে, চাঁদের অভিকর্ষের টান পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ। পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেমন ভারী ধাতু হিসাবে লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ধাতু আছে— মনে করা হয় চাঁদে তেমন নেই। তাই চাঁদ কিছুটা হালকা।

চাঁদের কেন্দ্রে যে লোহা, নিকেল, কোবাল্টের গলিত সমাবেশ নেই তার আরও প্রমাণ, চাঁদের চৌম্বকত্ব নেই— যেটা আছে পৃথিবীর। তোমরা জান পৃথিবী নিজেই একটা বড়ো-সড়ো চুম্বক। তাই পৃথিবীর উপরে রাখা একটি ঝুলন্ত চুম্বক আপনা-আপনি উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে।

পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখ। কেমন কালো কালো ছোপ্ ছোপ্ দাগ তার সারা গায়ে ছড়িয়ে আছে। ওসব হল চাঁদের গর্ত— বড়ো বড়ো গর্ত, যেখানে সূর্যালোক না পড়ার জন্য ওদের কালো দেখাচ্ছে। চাঁদে প্রায় ত্রিশ হাজার গর্ত আছে।

তোমরা যেন মনে কোরো না যে চন্দ্রবাসীরা ওসব গর্ত খুঁড়েছে। চাঁদে হাওয়া-বাতাস-জল-কিছুই নেই, তাই চন্দ্রবাসীও নেই। চাঁদের পিঠে গর্ত হয়েছে উল্কার আঘাতে। তাছাড়া পুরোনো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আছে— সেখানেও আলো পড়ে না।

গ্যালিলিও প্রথম তাঁর দূরবিনের মধ্য দিয়ে চাঁদকে দেখেছিলেন। চাঁদকে তো ওভাবে আগে আর কেউ দেখেনি। গ্যালিলিও দেখেছিলেন— চাঁদ মোটেই সমতল নয়। পৃথিবী থেকে খালি চোখে যেমন চক্‌চকে মনোমুগ্ধকর দেখায় চাঁদকে, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। চাঁদের গায়ে গ্যালিলিও দেখেছিলেন পাহাড়, গভীর গর্ত, গর্তের মধ্যে আলো-অন্ধকারের খেলা।

অন্ধকারে ঢাকা চাঁদের নিচু জায়গাগুলিকে গ্যালিলিও ভেবেছিলেন সাগর। সাগরকে ল্যাটিন ভাষায় 'মারিয়া' বলে। সেই থেকে চাঁদের সাগরগুলির নানান নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন, ৬৭৬ কিমি ব্যাসওয়ালা ইমব্রিয়াম সাগর আছে চাঁদে।

চাঁদের যে জায়গাগুলো উজ্জ্বল তা হল পাহাড়ের

চূড়া। যেমন লাইবনিজ পাহাড়। এটা উপত্যকার গভীর থেকে ২৬০০০ ফুট উঁচু। সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের এই পাহাড়, উপত্যকাগুলি একটা বিশেষ ভূমিকা নেয়। গ্রহণের সময় চাঁদ যখন সূর্যকে প্রায় ঢেকে ফেলে তখন চাঁদের পাহাড়-উপত্যকার ফাঁক দিয়ে সূর্যের টুকরো টুকরো আলোর রশ্মি পৃথিবীতে আসে। ফলে কালো চাঁদের চারপাশে একটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলোর মালা দেখা যায়— যেন তারে গাঁথা কিছু উজ্জ্বল আলোর পুঁতি। এর নাম 'বেইলির পুঁতি'।

চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো তাতে জ্বালামুখ বেশি আছে— ওপারে কম। জ্বালামুখগুলির ভিতর ও বাইরের ঢালটা ব্যাসল্ট পাথরে গড়া। জ্বালামুখগুলির নাম বিজ্ঞানীদের নামে দেওয়া হয়েছে। কোনটা প্লেটো, কোনটা আর্কিমিডিস, কোনটা কোপারনিকাস। এমনকি জুল ভার্ন-এর নামেও নামকরণ হয়েছে। ২০ থেকে ৫০ কিমি ব্যাস বিশিষ্ট জ্বালামুখ চাঁদে শ'দুয়েক আছে।

চাঁদ সম্পূর্ণ মৃত গোলক। অর্থাৎ, চাঁদে কোনও আগ্নেয়গিরি আর সক্রিয় নয়। চাঁদে ভূমিকম্প হয় না। চাঁদে বাতাস নেই— তাই ঝড় বৃষ্টি হয় না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চাঁদ একরকম রয়ে গেছে। পাথরগুলো তখন যেমন ছিল এখনও আছে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, কারণ বাতাসকে ধরে রাখার ক্ষমতা চাঁদের নেই। যদিও বা কোনোভাবে তাঁদের পেটের ভেতর থেকে কোন গ্যাস বেরিয়ে আসে সে গ্যাস চাঁদে বেশিক্ষণ থাকে না, মহাকাশে পালিয়ে যায়। চাঁদের অভিকর্ষের টান এতই কম যে চাঁদ সামান্য গ্যাসকেও ধরে রাখতে অক্ষম।

চাঁদের তাপমাত্রা ভীষণভাবে ওঠা-নামা করে। চাঁদের এক দিন পৃথিবীর ১৪টা দিনের সমান। আবার চাঁদের এক রাত মানেও ৩৩৬ ঘণ্টা। দিনে চাঁদ ভীষণ গরম, প্রায় ১২৫° সেলসিয়াস, রাতের তাপমাত্রা নেমে যায় –১৫০° সেলসিয়াসে। অবশ্য বড়ো দিন বা বড়ো রাত বলেই চাঁদের তাপমাত্রা এতটা বদলায় তা নয়। আসল কারণ, চাঁদে বাতাস নেই। বাতাস যেমন তাপ ধরে রাখে তেমনি বাতাস তাপকে বের হতেও দেয় না। পৃথিবীতে বাতাস আছে বলে দিনের তাপ চট্ করে মহাকাশে পালাতে পারে না, বাতাস তাপ ধরে রাখে। আবার একই কারণে রাতের শীত মহাকাশ থেকে এসে ঢুকতে পারে না। তাপমাত্রার একটা হেরফের হয় বলে চাঁদের পিঠের পাথর, নুড়িগুলি ফোঁপড়া, গুঁড়ো গুঁড়ো। চাঁদের পিঠের গুড়ো পাথরের ঘনত্ব মাত্র ১ গ্রাম/মিলি, অর্থাৎ জলের ঘনত্বের সমান। চাঁদের পিঠের এক টুকরো পাথর জলে ফেললে তা জলে ভাসবে, অর্থাৎ 'এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা'! চাঁদে বাতাস না থাকায় তাপের পরিচলন-পরিবহনও তেমন হয় না। যেখানে রোদ যেখানে তাপমাত্রা বেশি, রোদের পাশে যেখানে ছায়া সেখানে তাপমাত্রা বেশ কম। ছায়া খুব কালো দেখাবে, ছায়া-রোদের মিলন রেখা হবে স্পষ্ট। ঠিক এই ব্যাপারটা পৃথিবীতে হয় না।

চাঁদেতে নুড়ি পাথর ভেদ করে তাপ নীচে নামে না। একটু গভীরে গেলেই চাঁদ শীতল— একেবারে হিমশীতল। সেখানকার তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের নেই। অবশ্য বেশি নীচে গেলে আবার গরম লাগবে— ঠিক পৃথিবীর মতো। ভূতাত্ত্বিক কারণে এমনটা হয়, বিশেষত তেজস্ক্রিয় পদার্থের দৌলতে।

চাঁদের আকাশ কেমন দেখতে? পৃথিবীর আকাশ নীল, মঙ্গলগ্রহের আকাশ গোলাপি, চাঁদের আকাশের রং কী? দুঃখের ব্যাপার, চাঁদের আকাশের কোনও রং নেই। অর্থাৎ, চাঁদের আকাশ কালো, এক্কেবারে কালো। সেই কালোর মধ্যে উজ্জ্বল, চোখ-ধাঁধানো সূর্য ঘুরে বেড়ায়, অন্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে ঝক্‌ঝকে দেখায়। চাঁদের আকাশে ঝুলন্ত পৃথিবীকে নীল দেখায়। যেখানে যেখানে জ্যোতিষ্ক নেই, সেই জায়গাগুলি গভীর কালো। রাতের আকাশ যেমন কৃষ্ণময় তেমনি দেখায় তাঁদের আকাশকে— কী দিন, কী রাতে। এমন হয় কেন? চাঁদে কোন বাতাস নেই। কাজে কাজেই বাতাসে আলোর 'র‍্যালে স্ক্যাটারিং' হয় না, এজন্য আকাশ নীল দেখায় না। মহাকাশের কোনও রং নেই। রং আছে কেবল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উল্কাতে। মহাকাশের ফাঁকা জায়গায় সামান্য হাইড্রোজেন গ্যাস আছে, সে গ্যাসও বর্ণহীন।

চাঁদের নিজের কি কোনও রঙ আছে? চাঁদের পিঠ ধূসর কালচে হলে কী হবে, চাঁদকে দূর থেকে সাদা দেখায়— একেবারে দুগ্ধশুভ্র! পৃথিবী থেকে চাঁদকে সাদা দেখায়। শুক্রগ্রহকে খানিকটা তামাটে, সূর্যকে হালকা হলদে দেখায় বটে, তাই বলে চাঁদকে সাদা দেখায় কেন? সবটার জন্য দায়ী সূর্যের আলোর প্রতিফলন।

চাঁদকে সাদা দেখায় বলে প্রাচীনকালে রসায়নবিদেরা চাঁদের প্রতীক আর রুপোর প্রতীককে একটাই করেছিলেন। সেটা হল— এক ফালি চাঁদের ছবি। অ্যালকেমিতে রুপোর প্রতীক হল— এক ফালি চাঁদ। এজন্য রুপো সংক্রান্ত কোন কোন রসায়নিকের নামের মধ্যে 'চাঁদ' (লুনা) কথাটা আছে। যেমন, সিলভার নাইট্রেটের নাম— 'লুনার কস্টিক'।

চাঁদ ও পৃথিবী একসঙ্গে জোড়া জ্যোতিষ্কের মতো গত পাঁচশ কোটি বছর ধরে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও অনেক দিন ঘুরবে, যতদিন না সূর্য ফুলে ফেঁপে দুজনকেই গিলে নেবে! তবে ভয় নেই, এ সবের অনেক দেরি আছে।

চেনা-অচেনা সৌরজগৎ

প্রসাদরঞ্জন রায়

পাঠ্য বইতে আমরা যেমন পড়ি তাতে মনে হয় যে, সৌরজগতের প্রায় সবকিছুই আমাদের জানা হয়ে গেছে। বাস্তবে একথাটা আদৌ সত্যি নয়। যদিও পাঁচটা গ্রহ খালি চোখেই দেখা যায়, আর পুরাকাল থেকে এদের অবস্থান দেখাও হয়েছে, তবু অ্যারিস্টটল আর টলেমির ধারণায় পৃথিবী ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আর গ্রহগুলি পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করছে। এই ধারণা টিকে ছিল ১৫০০ বছরেরও বেশি আর রক্ষণশীল ক্যাথলিক চার্চও তাকে সমর্থন করেছে। ১৬০০ সালে সৌরকেন্দ্রিক ধারণার জন্য পুড়িয়ে মারা হয় জিওর্দানো ব্রুনোকে। শেষপর্যন্ত কোপারনিকাস-গ্যালিলিও-কেপলার এই সৌরকেন্দ্রিক ধারণাকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

সৌরজগতের পথপ্রদর্শক : কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও।

গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৬৪২-১৭২৭) প্রথম মহাকাশ দেখার টেলিস্কোপ তৈরি করেন আর সেই টেলিস্কোপ দিয়েই দেখেন সৌরকলঙ্ক আর চাঁদের পাহাড়-সমুদ্র। তিনিই প্রথম (১৬১০) আবিষ্কার করেন বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ— আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড আর ক্যালিস্টো। ডাচ বিজ্ঞানী **ক্রিশ্চান হুগেনস** (১৬২৯-৯৫) আবিষ্কার করেন শনির বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটান (১৬৫৫) আর শনির বলয়। এর পর ইতালিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী **জিওভান্নি ক্যাসিনি** (১৬২৫-১৭১২) আবিষ্কার করেন শনির চারটে উপগ্রহ আর শনির বলয়ের মধ্যে ফাঁক, যা আজও 'ক্যাসিনি ডিভিশন' নামে পরিচিত।

১৮ শতকে গ্রহগুলির দূরত্ব আর আয়তন সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। শতাব্দীর শেষের দিকে (১৭৮১) নতুন গ্রহ ইউরেনাস আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী **উলিয়াম হারশেল** (১৭৩৮-১৮২২)। এছাড়া তিনি আবিষ্কার করেন ইউরেনাসের দুটি চাঁদ— টাইটানিয়া ও ওবেরন (১৭৮৯)।

বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে ফাঁকটা খুব বড়ো, ওখানে একটা গ্রহ থাকা উচিত। খতিয়ে দেখতে গিয়ে **জিওভান্নি পিয়াৎজি** (১৭৪৯-১৮২৬) পেলেন একটা ছোট্ট গ্রহ - সেরেস (১৮০১), ব্যাস মাত্র ৪৮৭ কি. মি.। এর পরে পরেই আবিষ্কৃত হল পালাস (১৮০২), জুনো (১৮০৪) আর ভেস্টা (১৮০৭)। এদের বলা হয় অ্যাস্টেরয়েড বা গ্রহাণুপুঞ্জ। ১৯০০ সালের মধ্যে এরকম ৪৩০টি গ্রহকণার দেখা পাওয়া যায়, বর্তমানে এই সংখ্য প্রায় ১০,০০০।

১৯ শতকের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার নিঃসন্দেহে নেপচুন গ্রহ। ইউরেনাসের কক্ষপথের পরিবর্তন দেখে

লেভেরিয়ার (১৮১১-১৮৭৭) আর **অ্যাডামস** (১৮১৯-১৮৯২) এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ইউরেনাসের কক্ষপথের বাইরে আরেকটা বড়ো গ্রহ আছে। শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে তা ১৮৪৬ সালে খুঁজে বার করেন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী **জোহান গাল** (১৮১২-১৯১০)। এর ঠিক পরেই **উলিয়াম লাসেল** (১৭৯৯-১৮৮০) আবিষ্কার করেন

নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটন (১৮৪৮) আর ইউরেনাসের দুটি উপগ্রহ এরিয়েল আর আম্ব্রিয়েল (১৮৫১)। প্রায় একই সময়ে শনির আরেকটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭৭ সালে মঙ্গল আসে পৃথিবীর কাছাকাছি। তখনই **আসাফ হল** (১৮২৯-১৯০৭) মঙ্গলের ছোট্ট দুটি উপগ্রহ ফোবস আর ডিমস আবিষ্কার করেন। **জিওভান্নি শিয়াপারেল্লি** (১৮২৫-১৯১২) মঙ্গলের ম্যাপ তৈরি করেন আর তাতে দেখান অগুনতি ক্যানাল। এই নিয়ে মঙ্গলে জীবন আছে কী না এ বিতর্কের সৃষ্টি। পরে আর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ **পার্সিভাল লাওয়েল** (১৮৫৫-১৯১৬) প্রায় ৫০০ ক্যানালের হদিশ পান। এই শতাব্দীর শেষে বৃহস্পতি আর শনির দুটি ছোট উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়।

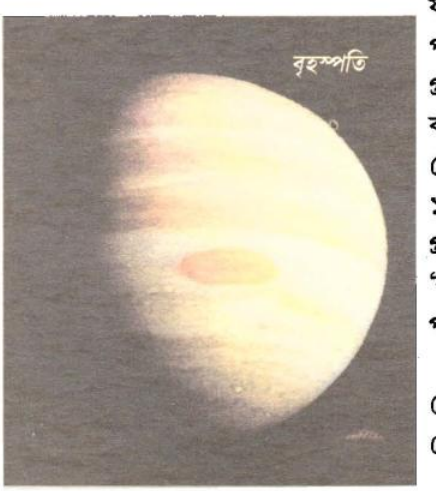

বিংশ শতাব্দীর শুরু হয় পরপর বৃহস্পতির কয়েকটি উপগ্রহ আবিষ্কার দিয়ে। তার পরেই পৃথিবী-কাঁপানো আবিষ্কার-নতুন গ্রহ প্লুটো (১৯৩০)। অনেকদিন ধরেই নেপচুনের পরে নতুন গ্রহের খোঁজ চলছিল, সে খোঁজ পেলেন আর এক মার্কিন বিজ্ঞানী **ক্লাইড টমবো** (১৯০৬-১৯৯৭)। এর পরেও অবশ্য চাঁদ আবিষ্কার থেমে থেকেনি— তালিকায় যোগ হয়েছে বৃহস্পতি আর শনির বেশ কয়েকটি চাঁদ। ডাচ বিজ্ঞানী **জেরার্ড কুইপার** (১৯০৫-১৯৭৩) আবিষ্কার করেন দুটি উপগ্রহ ইউরেনাসের মিরান্ডা (১৯৪৮) আর নেপচুনের নেরেড (১৯৪৯)। এই কুইপারই বলেন যে নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে আরও কিছু অ্যাস্টেরয়েড থাকতে পারে এদের নাম দেওয়া হয় 'কুইপার বেল্ট'। **চার্লস কাওয়াল** (জন্ম ১৯৪০) ১৯৭৪-৭৫ সালে বৃহস্পতির আরও দুটি চাঁদ আবিষ্কার করেন, এছাড়াও আবিষ্কার করেন নতুন গ্রহকণা, যা নিয়ে বেশ হইচই পরে যায়। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। তারপর আবিষ্কার হয় প্লুটোর চাঁদ চারন (১৯৭৮)— আবিষ্কারক **জেম্‌স ক্রিস্টি** (জন্ম ১৯৩৮)।

এবার অ্যাস্টেরয়েড প্রসঙ্গ। যদিও অধিকাংশ অ্যাস্টেরয়েডই মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝামাঝি, ১৯৩২ সালে আবিস্কৃত হয় অ্যাপোলো অবজেক্ট' এবং এ পর্যন্ত ৭৫০টি এরকম গ্রহকণা আবিষ্কার হয়েছে। চার্লস কাওয়ালের আবিষ্কৃত চিরন (১৯৭৭) বেশ বড়োসড়ো একটি টুকরো, দেখতে পাওয়া যায় শনি আর নেপচুনের মধ্যে। পরে এরকম আরও পাঁচটি গ্রহকণা নজরে এসেছে যাদের বলা হয় সেন্টর। আর কুইপার বেল্টের কথা আগেই বলা হয়েছে, ১৯৯২ সালের পর প্রায় ৭০,০০০ গ্রহকণা পাওয়া গিয়েছে, যারা 'কুইপার বেল্ট অবজেক্ট' নামে পরিচিত।

উপগ্রহের সংখ্যাও থেমে নেই। ১৯৮৪ সালে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইতে মোট উপগ্রহের সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে ৩৫। পৃথিবী (১), মঙ্গল (২), বৃহস্পতি (১৪), শনি (১০), ইউরোনাস (৫), নেপচুন (২) আর প্লুটো (১)। আর আজ? ২০০৪ সালের এপ্রিলে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩৭। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস আর নেপচুনের সর্বশেষ হিসেবে উপগ্রহের সংখ্যা যথাক্রমে ৬২, ৩১, ২৭ আর ১৩। অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ আর নানান মহাকাশযান থেকে পাঠানো ছবি থেকে এই তথ্য এসেছে। কেবল ২০০৩ সালেই

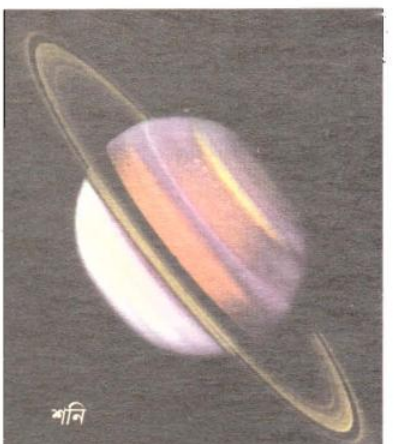

বৃহস্পতির ২৩টি চাঁদ আবিষ্কৃত হয়েছে, বিজ্ঞানীরা নাম দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না।

সম্প্রতি সকলের নজর গেছে সৌরজগতের শেষ সীমানায়। সেখানে বেশ কয়েকটি নতুন জিনিস নজরে এসেছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বরুণ (২০০০), ইক্সিয়ন (২০০১), এ ডব্লু ১৯৭ (২০০২) আর কোয়াওয়ার (২০০২) — এদের ব্যাস ৮০০ থেকে ১২০০ কিমি। সম্প্রতি আবিষ্কৃত সেডনা (২০০৩) আর ২০০৪ ডি ডব্লু (২০০৪) আরও বড়ো — ১৮০০ থেকে ২০০০ কিমি। অনেকে বলছেন এগুলো প্লুটোর পরের গ্রহ, প্ল্যানেট এক্স নামে যার খোঁজ চলছে অনেকদিন ধরেই। সেডনা বা ডি ডব্লু ২০০৪ কি গ্রহ? অধিকাংশ জ্যোতিবিজ্ঞানীদের মতে তা নয়, এগুলি **'কুইপার বেল্ট অবজেক্ট'** — শুধু তাই নয়, তাঁরা বলছেন, প্লুটো আর চারনও আদতে তাই, এখন গ্রহ বা উপগ্রহের রূপ নিয়েছে।

১৯৬২ সালে মেরিনার ২ থেকে আরম্ভ করে বহু মহাকাশযান থেকে সৌরজগৎ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। ভয়েজার-২ এর যাত্রাকালে (১৯৭৭-১৯৮৯) অনেকগুলি নতুন চাঁদ আবিষ্কৃত হয় আর জানা

অ্যাসটেরয়েড ইডা

যায় শুধু শনির নয়, বলয় আছে বৃহস্পতি, ইউরেনাস আর নেপচুনেরও। বর্তমানে মঙ্গল গ্রহে অনুসন্ধান চলছে, শনির কক্ষপথে ক্যাসিনি পৌঁছে যাবে এবছরের জুলাই মাসে, বুধের উদ্দেশ্যে মেসেঞ্জার রওনা হবে এ বছরই, কয়েক বছরের মধ্যেই প্লুটোর উদ্দেশ্যেও নতুন মহাকাশযান রওনা হবে। সুতরাং আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে সৌরজগৎ সম্বন্ধে।

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।

নতুন গ্রহ সেডনা ও তার সম্ভাব্য উপগ্রহ

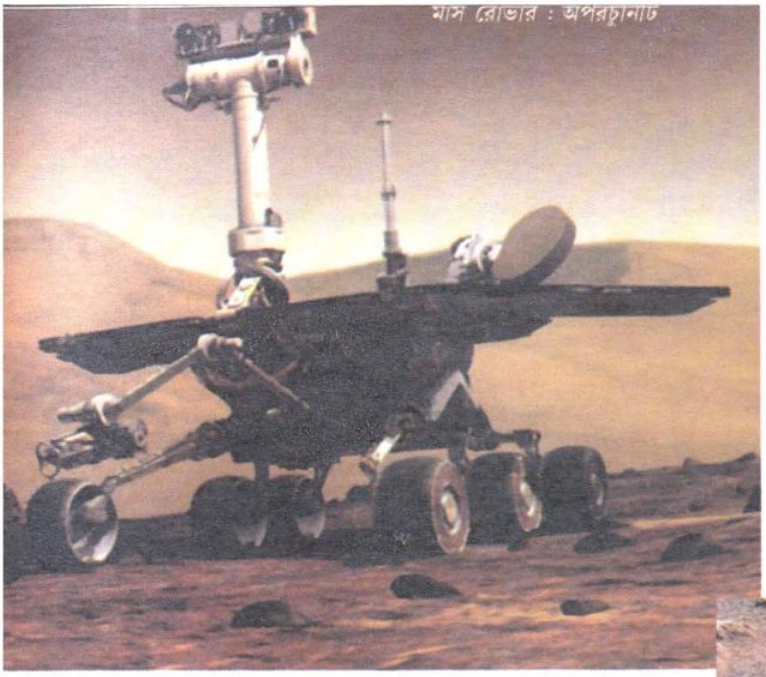
মার্স রোভার : অপরচুনাটি

শতাব্দীর জিজ্ঞাসা

মঙ্গলে প্রাণ?

অলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়

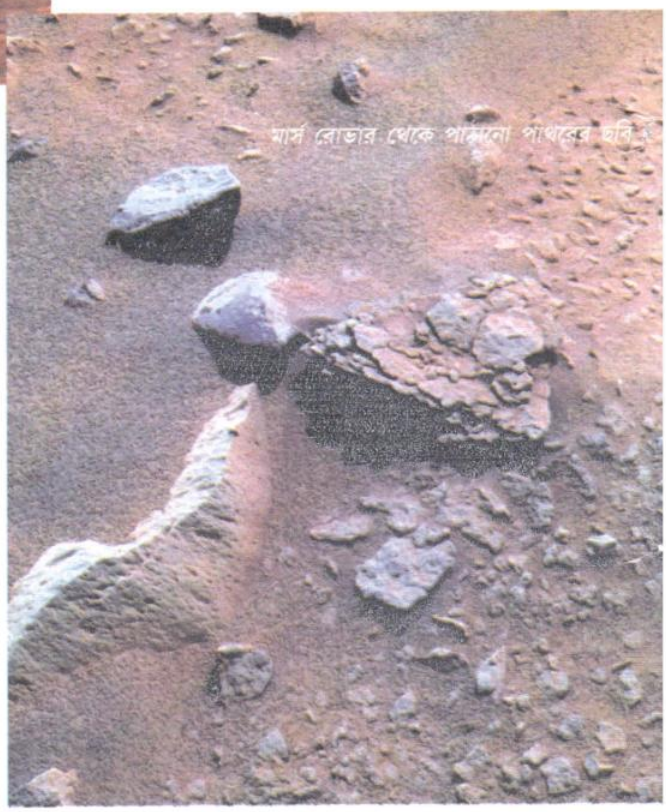
মার্স রোভার থেকে পাঠানো পাথরের ছবি

বেশ কিছুদিন ধরে মঙ্গলে জল আছে কিনা, প্রাণ আছে কিনা— এসব নিয়ে সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকাতে লেখালেখি চলছে। বিজ্ঞান পত্রিকার আবার ইন্টারনেট এডিশন আছে। সেগুলোতে প্রতিযোগিতা করে মঙ্গল সম্বন্ধে লেখা চলেছে। কারণ সংবাদপত্রই হোক আর বিজ্ঞানের পত্রিকাই হোক, মানুষের চাহিদাটা একটা বড়ো ফ্যাক্টর। পরিষ্কার করেই বলছি। এখন মানুষ এসবই শুনতে চায়।

এখন যে কটা জিনিস নিয়ে খুবই বাজার গরম সেগুলো হল : মঙ্গলে জল আছে, (প্রধানত আমেরিকান আবিষ্কার)। আর দ্বিতীয়টা হল মঙ্গলে মিথেন আছে। যার একটা মানে এও হতে পারে যে মঙ্গলে প্রাণ আছে। দ্বিতীয়টি ইউরোপিয়ান মহাকাশ সংস্থার 'মরেস এক্সপ্রেস' এর অবদান।

অন্য কোনও সভ্যতার কোনও বিজ্ঞানী যদি পৃথিবীকে উপর থেকে দেখেন। দেখবেন দিনের পর দিন মিথেনের পরিমাণ অল্প অল্প করে বেড়ে চলেছে। উল্টোদিকে আমরা যদি দশ বছর ধরে মঙ্গলে মিথেনের পরিমাণ দেখি আর যদি দেখি সেটা অল্প অল্প করে বেড়ে চলেছে, আমরা বলব এই মিথেনটা জীবমণ্ডলের জন্যে। কিন্তু এ-মুহূর্তে আমরা সে পর্যায়ে নেই। ফলে মিথেন থাকার দ্বিতীয় উৎস, আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত থেকে মিথেন এসেছে তাও হতে পারে।

বিশদে যাবার আগে মঙ্গল অভিযানের সাফল্যের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলে নেওয়া যাক। ২০০৪ সালের গোড়া থেকেই মঙ্গলের মহাকাশযানগুলো নজর কেড়েছে। প্রথম, **স্পিরিট**। আমেরিকার মহাকাশসংস্থা নাসার পাঠানো এই মহাকাশযানটির থেকে একটা ছোট্ট গাড়ি গোছের জিনিস নামিয়ে দেওয়া হয়। একে ল্যান্ডারও বলা হয়। তবে সাধারণভাবে এটাকে মহাকাশযান + ল্যান্ডার রোভার বলে উল্লেখ করা হয়। মূল মহাকাশযান 'মারান স্পিরিট' মঙ্গলের চারধারে ঘুরে চলেছে আর রোভারটাকে ৩রা জানুয়ারি 'জুসেভ ক্রেটার' নামে গর্তমতো জায়গায় নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে মঙ্গলগ্রহটার অনেক ছবি পাঠায়। সেই ছবি দেখে

মনে হয় পৃথিবীর বুকে পুরোনো সরোবরের মতো। তার মানে এরকম ব্যাখ্যা করা হতেই পারে যে মঙ্গলে আগে প্রচুর জল ছিল। খালবিল হ্রদ সব ছিল। কোনো কারণে, যা আমরা এখনও জানতে পারিনি, জলগুলো হয় উবে যায়, নয় জমাট তুষারে পরিবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় হিরো হল, স্পিরিটের যমজ **অপরচুনিটি**। এটা মঙ্গলের 'নিরক্ষরেখার' ওপর একটা অগভীর গর্তে নামে। যেখান থেকে পাঠানো ছবি দেখে বোঝা যায় যে ওই জায়গায় শুধু যে শিলা ছিল তা না। জলের সংস্পর্শে সেটার পরিবর্তনও ঘটেছে। কিছু রাসায়নিক জিনিসের অস্তিত্ব ধরা পড়ার ফলে এটা জানা যায়। তার মানে জলটা বেশ গতিশীল ছিল।

তৃতীয় হিরো ইউরোপিয়ান মহাকাশ সংস্থা পাঠানো **মার্স এক্সপ্রেস**-এর যে অংশটা মঙ্গলে নামিয়ে দেওয়া হয়, সেটা গত বছর ২৫ ডিসেম্বর নামে এবং তার পর থেকে বেপাত্তা। বিজ্ঞানীরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। জিনিসটা গেল কোথায়। এটার নাম রাখা হয়েছিল বিগ্‌ল। ডারউইন যে জাহাজে চেপে দেশ মহাদেশ ঘুরে ঐতিহাসিক বিবর্তন তত্ত্ব বার করেছিলেন সেই নামে। মূল মহাকাশযান ঘুরতে ঘুরতে ইতিমধ্যে নিশানা এনে দিয়েছে মিথেন গ্যাসের।

মিথেন গ্যাস সম্বন্ধে আমরা অল্পবিস্তর অনেককেই জানি। জীববিজ্ঞানের দিক থেকে এটার গুরুত্ব নিবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে। মার্স এক্সপ্রেস ছাড়াও দুটো আলাদা গবেষণাতে মঙ্গলে মিথেনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। একটার মূল গবেষক হলেন নাসার বিজ্ঞানী মাইকেল মুমশা আর অন্যজন আমেরিকার ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির গবেষক ভ্লাদিমির ক্র্যাস্ নেপোলস্কি। এরা পৃথিবীর বুকে বসে শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে মিথেনের চিহ্ন ধরতে পেরেছেন।

মঙ্গলের রুক্ষ প্রান্তর

গবেষণার ফলাফল জানার পর ক্র্যাস্ নেপোলস্কি বলেছেন, আমাদের পাওয়া রেজাল্ট এটাকে কন্‌ফার্ম করছে। প্রতি ১০০ কোটি ভাগে ১০.৫ ভাগ মিথেন। খুবই কম সন্দেহ নেই। কিন্তু জিনিসটা আছে। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ কারণ অনেকদিন জ্যোতির্জীববিজ্ঞানীরা বলে এসেছেন মিথেন পাওয়া গেলে মঙ্গলে ৩০০ বছরে এটা ভেঙে যায় নয় পরিবর্তিত হয়। আমরা এখন যে মিথেনটা পাচ্ছি। সেটা তিনশ বছর আগে ছিল এটা নিশ্চিত। তার আগে ছিল কি না জানার পর্যায়ে এখনও আসেনি। তবে এটা বলা চলে যে মঙ্গলের মাটির তলায় একধরনের মিথেনোজনিক ব্যাকটেরিয়া মিথেন তৈরি করে এমন সব অস্তিত্ব আছে। এ ব্যাপারে ক্র্যাস্ নেপোলস্কি মঙ্গলে ব্যাকটেরিয়া থাকায় চাষের সুবিধা হবে। যদিও অন্য সম্ভবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না সমমর্যাদার গবেষক এবং মার্স এক্সপ্রেসের মুখপত্র এ ব্যাপারে মনে করেন মঙ্গলে অগ্ন্যুৎপাত থেকেই এই মিথেন। মহাপণ্ডিতদের লড়াই যাই হোক, আমরা অবশ্য ব্যাকটেরিয়া পেলেই খুশি। এখন যেমন মঙ্গলে মিথেন নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে, তেমনি ২০০২ সালের মঙ্গলে ক্লোরোফিল পাওয়া গেছে বলে হইচই উঠেছিল। গত দুই বছর ধরে অবশ্য আর বিশেষ কিছু শোনা যায়নি।

যাইহোক, মনে পড়ছে ১৯৯৭ সালে নাসার পাঠানো সেই পাথফাইন্ডার? এটা পৌঁছেছিল ৪ঠা জুলাই। গানি ব্যাগ গোছের জিনিসের সঙ্গে একটা ছোটখাট গাড়ি পাঠায়, সেটা গুটগুট করে মঙ্গলের মাটিতে ঘুরে অনেক তথ্য পাঠায়। অনেক ছবি পাঠায়। এগুলোর বর্ণালি বিশ্লেষণ করে দু-জায়গায় ক্লোরোফিল পাওয়া যায়। এই সব ব্যাপারে নাসার তরফ থেকে আমেস রিসার্চ

সেন্টারের ড. ক্যারল স্টোকার ২০০২ সালের ৫ এপ্রিল BBC-র কাছে বলেন, পেয়েছি। তবে এক্ষুনি ঘটা করে বলা যাবে না।

এপ্রিল ৭ থেকে এপ্রিল ১১। দ্বিতীয় জ্যোতির্জীববিজ্ঞান কনফারেন্সে এটা আলোচনা হবার কথা ছিল। যে দুজনের রিসার্চ পেপার দেবার কথা ছিল তাঁরা হলেন ক্যারল স্টোকার আর প্যাস্‌কেল অ্যাসওয়াডেন, মঙ্গলে আরেস ভ্যালি বলে জায়গাতে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়।

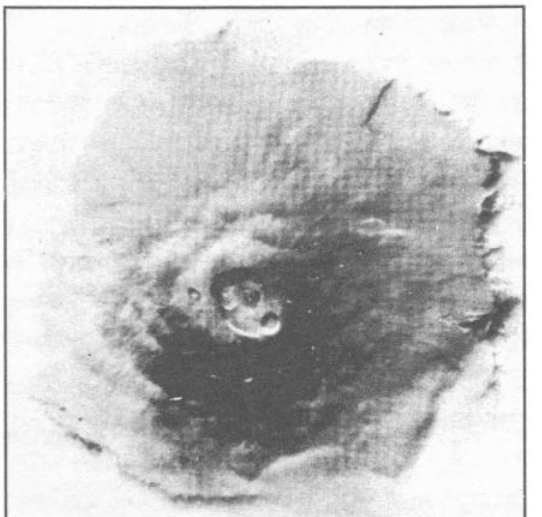

মঙ্গলের সর্বোচ্চ পাহাড় মন্‌স্‌ অলিম্‌পাস

এইসব ছবিগুলো এক সঙ্গে মিলেমিশে কী যেন করে এটাকে 'সুপার প্যান' বলা হয়। ছবিগুলো অনেক বড়ো করে বর্ণালি বিশ্লেষণ করা হয়। পাথফাইন্ডারে ক্যামেরা এই ছবি পাঠিয়েছিল। এই সুপারপ্যানের ছয় জায়গায় বর্ণালি বিশ্লেষণ পরীক্ষা করে ক্লোরোফিল প্লাস পাওয়া যায়।

তবে মঙ্গলে ক্লোরোফিল আছে, এটা জনসাধারণকে বলতে পারা মুশকিল। কিছু বিতর্ক ছিল। এত বড়ো ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কিছুটা বিতর্কিত অনুমানকে দাঁড় করাননি। কেন সেটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা না।

গত বছর স্পেস্‌ শাটল দুর্ঘটনার পর আমেরিকার পাবলিক নাসা তুলে দেওয়ার কথা বেশ সোচ্চারভাবে বলছিল। সেইজন্য অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে ২০০৩ সালের মাঝামাঝি দু'খানা মহাকাশযান পাঠানো হয়। এই মহাকাশযান দুটো নাসার শেষ আশা ভরসা ছিল। তাই এ দুটো কিছু ছবি পাঠাতে শুরু করতে নাসা অনেক ছবি বাজারে ছাড়তে থাকে এবং অন্য চ্যানেলকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া অনেকটা এইরকম— ছবি দেখে বোঝাই যাচ্ছে মঙ্গলে ব্যাকটেরিয়া আছে। সবাই লেক, জল, সমুদ্রতট সব দেখতে পেতে লাগল! অস্তিত্ব বাঁচাবার জন্য নাসা যে সব প্রচার করেছে সেগুলো বাদ দিয়ে স্রেফ বিজ্ঞানটা কী আমাদের দেখে নিতে হবে। একই কথা 'ইসা' ইয়োরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

আসলে মঙ্গলে প্রাণ আছে কিনা। সেটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের খুব গোড়ার প্রশ্ন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশিরভাগ মানুষের প্রশ্নই হল, আমরা কি মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ? এ ব্যাপারে বিস্তর ভাবনাচিন্তা আছে, কিন্তু কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। অনেক সময় অনেক কথাই বলা হয় স্পষ্টতরই যা বিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞানের আওতার বেশ কিছুটা বাইরে। যেমন— এস্‌ ই টি আই ('সেটি — সার্চ ফর এক্সট্রা টেরিস্‌ট্রিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স) কবে কোন এরাতে, আমাদের পাঠানো বেতার তরঙ্গ পৌঁছবে। সেখানে উন্নত মানুষ তার উত্তর দেবে, তার অপেক্ষায় সৌরবিজ্ঞানীর বেতার দূরবিন খুলে বসে থাকবেন ব্যাপারটা কৌতুককর।

অবশ্যই বিজ্ঞানের শিক্ষার দিকটাও আছে। যেমন, এমন অনেক তারা থাকতে পারে, যাদের পৃথিবীসদৃশ গ্রহ আছে এবং তাতে সভ্য মানুষ থাকতে পরে। তারা আমাদের মতো হতে পারে। খুঁজে পেতে লক্ষ বছরও লাগতে পারে। এর মধ্যে আবার সমীকরণ-টমীকরণের কথা আছে। ড্রেকের সমীকরণ যদি এতগুলো তারাতে মানুষ থাকে। যদি এতগুলো তারা যাকে তাহলে... কী এক অদ্ভুত ইকোয়েসন! কিন্তু মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, সেটা অনেক বেশি বোধগম্য। এবং আমরা যদি এমন কিছু প্রমাণ পাই যে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। তাহলে বলতে পারব যে পৃথিবীর বাইরে অন্তত একটা জায়গায় প্রাণের অস্তিত্ব আছে। আর যদি নাও পাই, তাতে কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় না যে মঙ্গলে প্রাণ নেই। ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ খোলা থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সৌরজগতের ভেতরে গবেষণা করতে পারি। তার বাইরের প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজার মতো প্রযুক্তি এখনও বের হয়নি।

পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণ আছে কী নেই। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য যে বিজ্ঞান তাকে বলে **জ্যোতির্জীববিজ্ঞান**। এটা একটা নতুন বিষয়। ১৯৯৮ থেকে এই বিজ্ঞানটা নাসার আমেস গবেষণাকেন্দ্রে চালু হয়েছে। জ্যোতির্জীববিজ্ঞানীরাও তাই অধীর আগ্রহে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করছেন।

এতক্ষণ আমরা জীববিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলাম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই পার্সিভাল লাওয়েল নামে একজন বিজ্ঞানী মঙ্গলে উন্নত সভ্যতা আছে বলে শুধু যে বিশ্বাস করতেন তাই না, প্রতিদিন

বড়ো দূরবিন দিয়ে মঙ্গলের খাল, বিল সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে বেড়াতেন। জিনিসটা এতই প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানীরা সব মহলেই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল যে মঙ্গলে উন্নত সভ্যতা আছে। মানুষের থেকে উঁচু কিছু।

স্বপ্নভঙ্গ ঘটাল আমেরিকার পাঠানো মহাকাশযান মেরিনার ৪। ১৫ জুলাই, ১৯৬৫ এটা মঙ্গলের ৬০০০ কিমি দূর থেকে ২১টা ছবি নেয়। ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল উন্নত প্রাণী সম্ভবত নেই। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেরিনার ৬ এবং তার পরের মাসে মেরিনার ৭ পাঠানো হয়। অগাস্ট মাসে এরা মঙ্গলের ছবি তোলে কাছ থেকে। প্রাণের অস্তিত্বের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। তবুও আশায় ছিল। হয়তো মঙ্গলে নামলে প্রাণের অস্তিত্ব মিলতে পারে। ১৯৭১ সালে মেরিয়ান ৯ মঙ্গলের চারপাশে ঘুরে অনেক ছবি দিল। তখন উন্নত অনুন্নত সভ্যতা সবই বাতিল। এরপর ১৯৭৫-এ ভাইকিং আর ভাইকিং ২ পাঠানো হয়। কিন্তু তাতে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা খুব কম। বড়জোর ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। তাই সই। এমন করে মঙ্গলের মহাকাশযানগুলো আর উন্নত সভ্যতা খুঁজছে না। খুঁজছে— এক. মঙ্গলে কোনকালে তরল জল ছিল কি না। তরল জল প্রাণের উদ্ভবের পক্ষে খুবই দরকার। দুই. মঙ্গলে ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাবে কিনা। এখন মঙ্গলকে এইসব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ছাড়াও, আমাদের ভবিষ্যৎ আবাস মঙ্গলে হতে পারে কিনা, সেটা ভাবা হচ্ছে।

মঙ্গলের প্লাসপয়েন্ট হল: (১) মঙ্গলে যত ক্ষীণই হোক. বায়ুমণ্ডল আছে। তাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর নাইট্রোজেন আছে। ভবিষ্যতে এই কার্বন ডাই অক্সাইড ভেঙে অক্সিজেন করতে পারলে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল হবে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন।

(২) মঙ্গলের মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর থেকে কম (১/৩)। কম মধ্যাকর্ষণে বাস করা সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষ মঙ্গলে গিয়ে দিব্যি থাকতে পারবে। কিন্তু বৃহস্পতিতে যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ উচ্চ— সেখানে থাকা যাবে না। (অন্য ফ্যাক্টর বাদ দিয়ে বলা হচ্ছে)

(৩) মঙ্গলের সর্বোচ্চ উষ্ণতা ৫০° সে। সর্বনিম্ন –৫০°সে.। পৃথিবীর সহ্য সীমার মধ্যে।

ভবিষ্যতে মানুষ যাতে মঙ্গলে বাস করতে পারে তার জন্য মঙ্গলকে পৃথিবী সদৃশ করার গবেষণা হচ্ছে। আর মানুষ গিয়ে বাস করলে নিশ্চয় বলতে পারব মঙ্গলে উন্নত প্রাণের অস্তিত্ব আছে। আজকে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে সূর্য থেকে উত্তাপ হঠাৎ কোনও কারণে বেড়ে যেতে পারে। সূর্যের কাজকর্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা খবু নিশ্চিত নন। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক জল উবে যাবে, খুব গরম পড়বে এবং অনেক দিন। তারপর ধরো গ্রহাণুরা প্রায়ই উঁকিঝুঁকি মারছে, কোনটা হঠাৎ পৃথিবীর ওপর পড়লে বছর খানেক অন্ধকারে বাস করতে হবে। এবং না খেয়ে মরতে হবে। একটা গামার বিস্ফোরণ পৃথিবীর বুকে ঘটলে জীবমণ্ডলের বেশ ক্ষতি হবে।

এসব থেকে বিজ্ঞানীরা মানুষ থাকতে পারে সৌরজগতে এরকম যে জায়গা খুঁজেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ মঙ্গল। এ ব্যাপারে রবার্ট জুব্রিন 'এ কেস ফর মার্স' বই তে লিখেছেনই, সারা পৃথিবী জুড়ে 'মার্স সোসাইটি ওয়েবসাইট্'ও প্রচার করে চলেছেন। সেনেটে প্রভাব খাটাচ্ছেন। রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের ধরছেন মঙ্গলে মানুষ পাঠাতে। জর্জ বুশ ইতিমধ্যে মঙ্গলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। রবার্ট জুব্রিন এই পরিকল্পনাকে বলেছেন চাঁদ-ফাঁদ হয়ে না, সটান মঙ্গলে। সোজাসুজি মঙ্গলেই হোক আর চাঁদ হয়েই হোক, মঙ্গল মানুষের বাসযোগ্য হলে, বিপদে আপদে আমরা সেখানে বাস করতে পারব। সেইজন্যে মঙ্গলের গবেষণা নিতান্তই বাঁচার লড়াই। মানবজাতির বাঁচবার জায়গা।

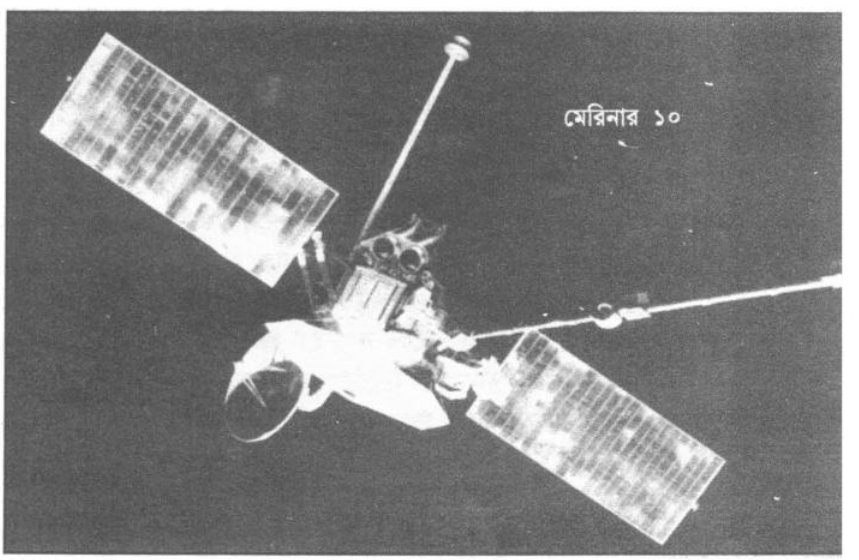

আলাথ্ কাড্

সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়

জায়গাটার নাম টাট্টাগুপ্পে। টাট্টাগুপ্পে হচ্ছে তালাগুট্টাপুরায়। ওখানে যাবার কোনো সম্ভাবনাই অবশ্য থাকত না যদি আলাথ্ কাড্ যাবার পথে তিথিমাথির রাস্তা ভুল করে পেরিয়া পাটনার রাস্তা না ধরতুম। ফলে নাগারহোলের জঙ্গলে পথ হারিয়ে তিথিমাথির বদলে পলিবেটা গিয়ে পৌঁছলুম। পলিবেটা থেকে আলাথ্ কাডের সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রাম বা ছোট শহর যাই বলিস, তা হল আম্মাথি। এ সব দাঁতভাঙা নাম শুনে ঘাবড়ে যাসনি। এগুলো সবই মাইশোর থেকে কোদাগু যাবার পথে পড়ে। যখনকার কথা বলছি তখন অবশ্য কোদাগুকে লোকে কুর্গ বলে জানত- কুর্গ জানিস তো? ফিল্ড মার্শাল কারিয়াপ্পার দেশ, মাইশোরের কাছেই।' রাঙাদাদু দম নেবার জন্যে একটু থামলেন। ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল — রাঙাদাদুর জন্যে হালকা সোনালি রঙের লিকারে দু ফোঁটা লেবুর রস দেওয়া চা। বুলু চায়ের কাপটা রাঙাদাদুর হাতে দিতে দিতে বলল, 'রাঙাদাদু আপনার লেমন টি।'

বাবলু ট্রের ওপর থেকে নিজের কাপটা নিতে যাচ্ছিল, বলে উঠল, 'হল না বুলু দিদি। লেমন আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, ওটা হবে লাইম, লেমনের থেকে সাইজে ছোট আর রং-ও হলদের বদলে সবুজ— বলে না লাইম গ্রিন।' বড়ো পিসির নাতি ঋদ্ধিমান উৎসুক হয়ে রাঙাদাদুর গল্পটা ফের শুরু হবার অপেক্ষা করেছিল, বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'আঃ বাবলুমামা, বুলুমাসি তোমরা থামবে। রাঙাদাদুর গল্পটাই শোনা হচ্ছে না।' নাতনির নাতি ঋদ্ধিমানকে রাঙাদাদু আদর করে বুদ্ধিমান বলে ডাকেন। বললেন, 'দাঁড়া আগে চা-টা শেষ করি।'

রাঙাদাদু ইদানীং তামাক ছেড়ে দিয়েছেন। চায়ের কাপে শেষ চুমুকটি দিয়ে সেটা মুনিয়ার হাতে দিয়ে ইজিচেয়ারটিতে জাঁকিয়ে বসে শুরু করলেন— 'সেটা বোধহয় সাতান্ন আটান্ন সাল হবে। আমি তখন নীলগিরির মেরিডেল টি-এস্টেটের মার্কেটিং-এর কাজকর্ম দেখার জন্যে ব্যাঙ্গালোরে থাকি। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় মেরিডেলের জেনারেল ম্যানেজার অবিনাশ মালহোত্রা একজনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের রেসিডেন্সি রোডের আপিসে এসে হাজির। ভদ্রলোকের নাম আস্পি আদাজানিয়া। লালচে ফরসা রং, বিশেষ করে বিশাল খাঁড়ার মতন নাক দেখেই অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল ভদ্রলোক পারসি। মালহোত্রা ক্রমেই বললেন, কুর্গে মুথাইয়া বলে এক ভদ্রলোকের 'আলাথ্ কাড্' নামে একটি কফি এস্টেট বিক্রি আছে- প্রায় ষাট সত্তর একরের মত জমি নিয়ে। আদাজানিয়া সেটি কিনতে

চান। আমি যদি মুথাইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে আদাজানিয়া সাহেবকে সেই এস্টেটটি দেখাবার বন্দোবস্ত করি তাহলে বড়ো ভালো হয়। মালহোত্রা আমাকে মুথাইয়ার ঠিকানাটি দিলেন— ভদ্রলোক ব্যাঙ্গালোরেই থাকেন। তারপর আদাজানিয়াকে বললেন, 'নাউ চ্যাটার্জি উইল টেক ওভার। আমি চায়ের নিলামের জন্য কোচিন যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখা হবে। চিয়ারিও।'

আদাজানিয়ার সঙ্গে আলাপ জমতে বিশেষ সময় লাগল না। ভদ্রলোক বেশ মিশুকে। শিকার, মাছধরা এবং ফোটোগ্রাফির শখ। বাড়ি বম্বেতে। বোম্বাই ভাষায় যাকে বলে 'বিন্‌দাস', স্বভাবে একেবারে তাই। সুতরাং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একে অপরের কাছে আস্‌পি এবং যতীন হয়ে উঠলুম।

মুথাইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক হল পরের দিন ভোর ছটা নাগাদ ব্যাঙ্গালোর থেকে বেরুনো হবে। আলাথ্‌ কাড্‌ ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার দূরে— পৌঁছতে পৌঁছতে ঘণ্টা পাঁচ ছয় তো লাগবেই। ওখানে মুথাইয়ার এস্টেট বাংলোতে দু'তিন দিন থেকে সমস্ত দেখা শোনা সেরে ফিরে আসা যাবে— তাছাড়া নাগার হোলের ওয়াইল্ড লাইফ আর কাবেরী নদীর শাখাপ্রশাখায় 'মহাশের' মাছ শিকার করার সুযোগ তো আছেই। মুথাইয়াও আমাদের সঙ্গে যাবেন।'

রাঙাদাদু একটু থামলেন। ছোটপিসি একটু আড়ালে মেজদাকে বলল, 'রাঙাদাদুর বোধহয় তামাক ইচ্ছে হচ্ছে।' রাঙাদাদু নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিলেন, মুচকি হেসে পকেট থেকে ইয়া বোম্বাই সাইজের একটি চুরুট বার করলেন কিন্তু ধরালেন না। দু'আঙুলে চুরুটটি ধরে বললেন, 'বড্ড পুরোনো নেশা কিনা, ছাড়া মুশকিল। যাক্‌গে, যে কথা বলছিলুম। আলাথ্‌ কাড যাবার জন্য একটি ডজ স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করা হল। ভোর পাঁচটায় ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির হবে। আস্‌পি ঠিক করল রাত্তিরটা ও আমাদের গেস্ট হাউসেই কাটাবে যাতে সকালে বেরুতে দেরি না হয়। আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ডিনার সেরে আমরা গোছগাছ সেরে নিচ্ছিলুম। আদাজানিয়ার মালপত্রের মধ্যে দুটি বিশাল ব্যাগের একটিতে ওর নিকন ক্যামেরা আর লেন্স— তারমধ্যে একটি আবার বিশাল সাইজের টেলিফোটো লেন্স। আস্‌পি বলল নাকি ক্যামেরার চেয়ে লেন্সের দাম বেশি। অন্য একটি লম্বা মতন ব্যাগে ওর রেমিংটন ৩০০ রিপিটিং রাইফেল এবং একটি পার্ডি অ্যান্ড পার্ডির ১২ বোরের বন্দুক। বুঝলুম জঙ্গলে যাওয়ার জন্যে ও প্রস্তুত হয়েই এসেছে। মুথাইয়া অবশ্য দুপুরবেলাতেই বলেছিল যদি আমরা মাছ ধরতে যাবার ইচ্ছে করি তার সমস্ত ব্যবস্থা ওর এস্টেটে আছে। ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে আমরা শোবার যোগাড় করছি এমন সময় মুথাইয়ার কাছ থেকে একজন লোক এসে উপস্থিত হল। বিকেলে নাকি মুথাইয়ার গিন্নির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। যদিও চিন্তার বিশেষ কারণ নেই কিন্তু তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। এই অবস্থায় মুথাইয়া খুবই দুঃখিত যে ও আমাদের সঙ্গে যেতে পারছে না, আমরা যেন কিছু মনে না করি। ওর এস্টেটে খবর দেওয়া হয়েছে। সন্ধেবেলায় ও একজনকে সব বন্দোবস্ত করার জন্যে সেখানে পাঠিয়েও দিয়েছে। ও আমাদের একটি চিঠি ও রাস্তার ম্যাপ হাতে এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং ওর এস্টেটের লোককে দেবার জন্য আর একটি চিঠি। আমরা প্রথমে ভেবেছিলুম যাওয়া পিছিয়ে দেব। কিন্তু আস্‌পির বম্বেতে ফেরবার তাড়া ছিল। আর তাছাড়া আমরা এস্টেট দেখতে যাচ্ছি— মুথাইয়ার সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে নয়। সুতরাং প্ল্যান মোতাবেক কাল ভোরে রওনা হওয়াই ঠিক হল। তোদের বলেছি বোধহয় জঙ্গল পাহাড়ের রাস্তায় যেতে হবে বলে একটি ফোর হুইল ড্রাইভ ডজ স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করেছিলুম, তখনকার দিনে তোদের এইসব সুমো, কোয়ালিস, স্করপিও-টিও তো ছিলনা। তার ড্রাইভার স্থানীয় লোক- নিশ্চয়ই রাস্তাঘাট চিনবে।

কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় দরজায় বেল বাজল। গাড়ি এসে গেছে। ড্রাইভারের নাম জয়াকুমার। নাকি সাড়ে চারটের সময়ই পৌঁছে গেছে। সোয়া পাঁচটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। তখনও একটু একটু অন্ধকার ছিল। বছরের এই সময়টায় ব্যাঙ্গালোরে ছটার আগে সূর্যোদয় হয় না। দেখতে দেখতে আমরা শহর ছেড়ে ওল্ড ম্যাড্রাস রোডে এসে পড়লুম। চারদিকে খোলামেলা, এখনকার মতন তখন এত সব কলকারখানা তৈরি হয়নি। রাস্তার ধারে ধারে ধান, বাজরা, রাগি আর আখের খেত। দেখতে দেখতে সূর্য উঠল। রাস্তা ভালো, বিশেষ গাড়িঘোড়ারও ভিড় নেই, মাঝে মাঝে দু'চারটে মাল-বোঝাই লরি। পৌনে আটটা নাগাদ রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমরা কামাথের হোটেলে ব্রেকফাস্ট খেলুম, ইডলি, বড়া, সাম্বর আর সুজির দোসা। ইডলিগুলো দারুণ, কলাপাতা দিয়ে মুড়ে তারপর স্টিম করা জায়েন্ট সাইজ কুলফি বরফের মতন শেপ, মোড়ক খুলে মুখে দিতে না দিতে মিলিয়ে যায়। আমিই বললুম, অজানা জায়গায় যাওয়া, পথে কোথায় কী পাওয়া যায় না যায় ঠিক নেই, ব্রেকফাস্টটা ভালো করে করে নেওয়াই ভালো। হোটেলে চুড়ো করে ব্রাউন রঙের বাদাম কিশমিশ লাগানো লাড্ডু সাজানো ছিল— তাও দুটো

দুটো করে খাওয়া হল— জিজ্ঞেস করে জানা গেল সেগুলো নাকি গঁদের লাড্ডু। হ্যাঁ, যে গঁদ দিয়ে আঠা তৈরি হয় তাই। খেতে কিন্তু মন্দ লাগল না। হোটেলটা যে-জায়গায় তার নামটিও বেশ— জনপদলোকা। জনপদলোকা ছাড়লুম পৌনে নটায়। মাইশোর রোড দিয়ে যাচ্ছি— এর পর চেন্নাপাটনা তারপর টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গ পাটনা, তারপর মাইশোর— ঘণ্টা দুই আড়াইয়ে পৌঁছে যাওয়া উচিত। যতদূর মনে পড়ছে মুথাইয়া বলেছিল, মাইশোর থেকে আলাথ্ কাডের দূরত্ব একশ পনেরো কিলোমিটারের মতো। রাস্তার দু'পাশে দেখছি এবার সব তামাকের চাষ, মাঝে মাঝে কিছু আখ, দু'চারটে কলাবাগানও নজরে পড়ল। ডানদিকে একটু দূর দিয়ে রেললাইন চলে গিয়েছে, সিংগল লাইন, কিছুক্ষণের মধ্যে কু ঝিক ঝিক করতে করতে ধোঁওয়া উড়িয়ে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে গেল। আমাদের ড্রাইভার জয়াকুমার বলল ওটা মাইশোর যাবার গাড়ি। সকালবেলায় ব্যাঙ্গালোর থেকে এই গাড়ি চড়ে মাইশোর গিয়ে— সারাদিন শহর দেখে সন্ধেবেলায় এই গাড়িতেই আবার ব্যাঙ্গালোর ফিরে আসা যায়।

চলতি গাড়িতে আমার কখনোই ঘুম আসেনা, আদাজানিয়া দেখি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা। অবশ্য আমাদের স্টেশন ওয়াগনের ভেতরে জায়গার অভাব নেই, বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসা যায়। পিছনের সিটটা ভাঁজ করে দিলে অনায়াসে শুয়েও পড়া যেতে পারে। জয়াকুমার বলল বাইরে কোথাও গেলে ও রাত্রে গাড়িতেই শোয়। দেখতে দেখতে মাইশোর পেরিয়ে গেল। মাইশোরের পর হুনসুর। ইতিমধ্যে আস্‌পি উঠে পড়েছিল, বলল, 'চ্যাটার্জি একটু চা খেতে পারলে হত'। আমারও মনটা চা চা করছিল তাই হুনসুর পেরিয়ে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়িটা থামানো হল।' ঠিক এই সময় বাড়ির নতুন কাজের লোক ধনুকধারী এক থালা গরমাগরম বেগুনি, ফুলুরি নিয়ে এসে ঢুকল, বলল 'মা বোলিয়েসেন রাঙাদাদাজির চায়ে আভি এসবেন তুরন্ত (তাড়াতাড়ি) থালাঠো খালি করিয়ে দিন ঔর ভী তলা (ভাজা) হচ্ছেন'। রামবালক দেশে যাবার সময় বদলি হিসেবে তার খুড়তুতো ভাই ধনুকধারীকে দিয়ে গেছে। বাংলা শেখায় তার ভারী উৎসাহ।

ফুলুরি বেগুনি শেষ হবার পর ভুটে জিজ্ঞেস করল 'রাঙাদাদু, ওই টাটা গুপী আর গ্যাঁট্টাগোট্টাদের কথা কী যেন বলছিলেন?' ভুটের ছ'মাসের বড় দিদি মুনিয়া বলে উঠল, 'এই ভুটেটার মাথায় একদম ছাগবর পোরা, রাঙাদাদু বললেন না, ওগুলো সব কর্ণাটকের জায়গার নাম?'

রাঙাদাদুর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পাশের টেবিলের অ্যাশট্রে থেকে না ধরানো চুরুটটা দু'আঙুলে তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ জায়গাগুলোর নাম একটু উদ্‌ভুট্টে প্যাটার্নের বটে। যা বলছিলুম, হুনসুরে চা খাওয়ার পর আবার রওনা হয়ে দেখি রাস্তার ধারে একদিকে মাইলস্টোনে লেখা আছে মারকারা আর পেরিয়া পাটনা। মারকারা জানতুম কুর্গের সবচেয়ে বড়ো শহর, যাকে আজকাল মাদিকেরি বলে। পেরিয়া পাটনার নামটা জানা ছিল না। রাস্তাটা সেখানে আবার দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে— অন্যদিকের মাইলস্টোনটায় লেখা আছে বিরাজপেট আর পঞ্চভাল্লি তার ওপরে আবার একটা বোর্ডে তীর এঁকে লেখা 'টুওয়ার্ডস কেরালা। এবার কোনদিকে যেতে হবে সেটা জানার জন্যে মুথাইয়ার ম্যাপটা দেখার দরকার। তখনই হল মুশকিল। খুঁজতে দিয়ে দেখা গেল মুথাইয়ার দেওয়া চিঠিটি আছে বটে কিন্তু ম্যাপটা নেই। শেষ কালে আদাজানিয়ার মনে পড়ল শেষবারে মতন ম্যাপটা দেখবার পরে সেটা ও ব্যাঙ্গালোরের আমাদের গেস্টহাউসের ঘরের ড্রেসিং টেবলের ওর রেখেছিল তারপর আর তুলতে বেবাক ভুলে গেছে। জয়াকুমারও বিশেষ কিছু বলতে পারল না। জানা গেল ও আসলে স্থানীয় লোকই নয়, ওর বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজাগে, এবং এই পথে ও এর আগে আসেনি— ও ভেবেছিল আমরা নিশ্চয়ই রাস্তা জানব। শেষকালে আদাজানিয়া এবং জয়াকুমার দুজনেই বলতে লাগল, যেহেতু আমাদের গন্তব্যস্থল আলাথ্ কাড্ কুর্গে এবং যেহেতু মারকারাও কুর্গের বড় শহর সেই হেতু আমাদের ওই পথেই যাওয়া উচিত। পথে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে। তিথিমাথির কথাটা আমাদের কারোই মনে পড়ল না। আমরা পেরিয়াপাটনার রাস্তাটাই ধরলুম। আমার কিন্তু মনটা খচ্‌খচ্ করতে লাগল পেরিয়াপাটনার নামটা মুথাইয়ার সঙ্গে কথাবার্তার সময় একবারও এসেছে বলে মনে পড়ল না।'

রাঙাদাদু একটু থামলেন। ভুটের দিদি জয়া বলে উঠল, 'বাব্‌বা, কতগুলো পাটনারে বাবা। আমি তো জানতুম— একটাই পাটনা, বিহারে লালুপ্রসাদের দেশে।' বড়দির ছেলে বাপ্পা কখন এসে তক্তপোষের কোণে বসেছিল কারো খেয়াল হয়নি— বলল, 'তোদের নিয়ে হয়েছে বিপদ, না পড়বি ইতিহাস, না শিখবি ভাষা' বিহারের পাটনা হচ্ছে সম্রাট অশোকের পাটলিপুত্রের অপভ্রংশ আর কর্ণাটকের চেন্নাপাটনা, পেরিয়াপাটনা, শ্রীরঙ্গপাটনা এসেছে জনবসতি বা পত্তন থেকে, যেমন শ্রীরঙ্গপত্তনম থেকে শ্রীরঙ্গ পাটনা, বুঝলি।'

ছোটপিসি গল্পে বাধা পড়ায় রেগে যাচ্ছিল, বলল

'সবাই একদম চুপ এরপর কেউ একটিও কথা বলবে না বলে দিলাম, আপনি বলুন রাঙাদাদু।' রাঙাদাদু হাতের চুরুটটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে শুরু করলেন 'পেরিয়াপাটনা পর্যন্ত রাস্তায় কিছু লোক চলাচল দেখা যাচ্ছিল— দু'পাশে বড়ো বড়ো গাছ শুরু হয়ে গিয়েছিল, মাঝে মধ্যে সুপুরির ঝাড়, বাঁশ ঝাড়। বোঝা যাচ্ছিল আমরা ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠছি এবং জঙ্গল এলাকা শুরু হয়ে গেছে— যা ক্রমশ ঘন হচ্ছে— মানুষজনের দেখাসাক্ষাৎ নেই। বুঝলুম এই হচ্ছে নাগারহোলের জঙ্গল। রাস্তাটাও সরু হয়ে এসেছে, পাশাপাশি দুটো গাড়ি চলবার মতন নয়। খানিক বাদে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা চেকপোস্ট এল — সেখানে রাস্তার ওপরে আড়াআড়ি ভাবে বাঁশের ব্যারিকেড লাগানো। ফরেস্ট গার্ডেরা এসে আমাদের গাড়ি দেখে ব্যারিকেড উঁচু করে দিল— আলাথ্ কাড যেতে হলে যে সেখান থেকে কী ভাবে যেতে হবে সে সম্বন্ধে তারা কিন্তু বিশেষ কিছু বলতে পারল না। সত্যি বলতে কী, তারা যে কী ভাষায় কথা বলছে সেটাই আমরা ঠিক মতন বুঝতে পারছিলুম না। জয়াকুমার মোটামুটি কানাড়া জানে, সে বলল এরা কুর্গী ভাষায় কথা বলছে— পরে জেনেছিলুম সে ভাষার নাম হচ্ছে 'কোদাভা থাক'— মালয়ালমের সঙ্গে তার খানিক মিল আছে। কিন্তু তখনও আমি মালয়ালম জানতুম না। কতকটা আভাসে ইঙ্গিতে কতকটা আন্দাজে আমাদের মনে হল যে আরও দশবারো কিলোমিটার আগে বাঁ দিকে যে রাস্তাটা বেঁকে গেছে সেই রাস্তায় পলিবেটা আসবে— খুব সম্ভবত সে খানে আলাথ্ কাড এস্টেটের সন্ধান পাওয়া যাবে। কী আর করা, ঘন জঙ্গলের ভেতরের সেই রাস্তায় আমাদের গাড়ি চলতে লাগল— খানিকক্ষণ বাদে রাস্তার ধারে একটি সাইনবোর্ড দেখতে পাওয়া গেল— তাতে বেশ বড়ো বড়ো অক্ষরে কিছু লেখা রয়েছে— জয়াকুমার পড়ে বলল কানাড়ায় লেখা তালাগুট্টাপুরা ফরেস্ট রেঞ্জ, নাগার হোলে। হিসেবে অনুযায়ী সেই খানেই আমাদের বারো কিলোমিটার পথ শেষ হয়ে বাঁদিকে মোড় আসার কথা। কিন্তু কোথায় বা কী? আরও পাক্কা সাড়ে ন'কিলোমিটার যাবার পর জঙ্গলের মধ্যে বাঁ-দিকে যাবার একটি সরু রাস্তা পাওয়া গেল, বনের মধ্যে বটে কিন্তু রাস্তাটা পাকা। যা থাকে কপালে বলে আমরা সেই রাস্তায় ঢুকে পড়লুম। অজগর ঘন জঙ্গলের মধ্যে পথ। রাস্তার দু'দিকে জানা-অজানা বড়ো বড়ো গাছের ভিড়— তলায় ঠাসা ঝোপঝাড়। এই জঙ্গলে বড়ো জানোয়ারের অভাব নেই, মায় বাঘ পর্যন্ত আছে বলে শুনেছি। হাতি যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল রাস্তার পাশে এক

বিধ্বস্ত বাঁশঝাড় দেখে। রাস্তার ওপর হাতির ইত্যাদিও পড়ে আছে দেখা যাচ্ছিল। বেশ কয়েক কিলোমিটার যাবার পর দেখি রাস্তার ডানদিকে খানিক খোলা জায়গা আর সেখানে বেশ কিছু লোকজন— একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকজন খাকি পোষাকের লোকও। কেমন একটা উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া। আমরাও গাড়ি থামালুম। যা বোঝা গেল কাছাকাছি কোথাও-না-কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। খাকি পোষাকের লোকের মধ্যে কিছু পুলিসের আর বাকিরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। ফরেস্ট রেঞ্জারের নাম ডা. শিবরাম। তিনি আবার একজন জন্তুজানোয়ারের চিকিৎসক। জঙ্গলের মধ্যে নাকি টাট্টাগুপ্পে বলে একটি গ্রাম আছে। সেখানে সমস্ত জমিতে কলার চাষ। এ জঙ্গলে এরকম কলার চাষ নাকি বেশ কয়েক জায়গায় আছে। সারা দক্ষিণ ভারতে এইসব কলা রপ্তানি হয়। টাট্টাগুপ্পের ইলচি বা ইলাইচি (এলাচের গন্ধযুক্ত) কলা এই অঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি এখানে হাতির উপদ্রব শুরু হয়েছে — তারা সমস্ত কলাবাগান একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। এমনিতে হাতির পাল তাড়াবার জন্যে গ্রামবাসীরা আগুন-টাগুন জ্বালিয়ে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে হই-হুল্লোড় করে। কিন্তু এবারের হাতিগুলোর দলে একটা এক দাঁতওয়ালা রোগ্ এলিফ্যান্ট আছে। সেটা মানুষকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেনা। ডা. শিবরাম বললেন, হাতিটা নিশ্চয়ই কোনো সময়ে কোনও আরকের দোকানে হানা দিয়েছিল। আরক হচ্ছে ওই অঞ্চলের খুব কড়া দিশি মদ। তাই খেয়ে খেয়ে সে এমন নেশাখোর

হয়েছে যে বেছে বেছে তারপর থেকে প্রায়ই সেটা আরকের দোকানে বা আরক তৈরির আস্তানায় ঢুঁ মারে। নেশার খোঁজে ব্যাটা লোকালয়ে ঢুকে উপদ্রব করতেও দ্বিধা করত না, বেশ কয়েকজনকে জখম করেছে। তার অত্যাচারে গাঁয়ের লোক জেরবার। তখন অবশ্য সেটার দুটো দাঁতই ইনট্যাক্ট ছিল। বছর দু'তিন আগে বোধহয় আরকের সন্ধানেই হাতিটা এখান থেকে বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দূরে এক কফি এস্টেটের এলাকায় ঢুকে পড়ে। সেই এস্টেটের প্ল্যানটারের রাইফেলের গুলিতে হাতিটার একটা দাঁত ভেঙে যায়। হাতিটা ক্ষেপে গিয়ে তাড়া করে সেই প্ল্যানটারকে ধরে মেরে ফেলে। ভদ্রলোকের রাইফেল সমেত ডান হাতটা হাতিটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁধ থেকে ছিঁড়ে নেয়। তারপর বেশ কিছুদিন হাতিটার খোঁজ ছিল না। ইদানীং আবার তার উপদ্রব শুরু হয়েছে। বনবিভাগের সন্দেহ টাট্টাগুপ্পের কলাবাগানে হাতির যে দলটা ঢুকেছিল তার মধ্যে সেই একদেঁতো বদমাইশটাও আছে— ডা. শিবরামের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনোরকমে সেটাকে ধরে কাবেরী নদীর ধারে ওঁদের এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া আর নিতান্ত তা না হলে সেটাকে মেরে ফেলতেও হতে পারে। আমাদের ঔৎসুক্য হচ্ছিল ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় দেখবার জন্যে- কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে, কতক্ষণে আলাথ্ কাড পৌঁছব কে জানে এই সব কারণে আর দাঁড়ানো গেল না। সত্যি কথা বলতে কী, খিদেও খুব পেয়েছিল। ওদের কাছ থেকেই জানা গেল আমরা পেরিয়াপাটনার রাস্তা ধরেই ভুল করেছি। অন্য রাস্তাটা দিয়ে পঞ্চভাল্লি তিথিমাথি হয়ে গেলে আমরা অনেক আগেই এস্টেট পৌঁছে যেতুম। তিথিমাথি নামটা আমরা একেবারেই ভুলে খেয়েছিলুম। অবশ্য একটা সান্ত্বনা যে ওই পথ দিয়ে গেলে আর আমাদের নাগারহোলের জঙ্গল দেখা হত না। এখন আমরা যে পথে যাচ্ছি সেই পথ ধরে সোজা গেলে তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা আম্মাথি পৌঁছে যাব। আম্মাথি থেকে আলাথ্ কাড কাছেই। ডা. শিবরাম কাবেরী নদী তীরে 'দুবারে'তে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে আমাদের নেমন্তন্ন জানালেন, বললেন হাতিদের স্নান করানো, খাওয়ানো, পোষার কায়দা দেখাবেন। হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল সাফারিও করা যেতে পারে। উনি ওখানেই থাকেন। টাট্টাগুপ্পেতে আর দেরি না করে আমরা গাড়িতে স্টার্ট দিলুম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলাথ্ কাড পৌঁছতে পারলে হয়। খিদের চোটে পেটের ভেতরে ছুঁচোরা ডন দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাস্তাটা ক্রমে ক্রমে মোড় ঘুরে ঘুরে ওপর দিকে উঠছে। ধীরে ধীরে জঙ্গলও হালকা হয়ে এল। এখন দু'পাশে প্রায়ই কফির বাগান, কোথাও বা সুপুরি বাগান, কমলালেবুর চাষ— যাকে অর্চার্ড বলে তাও দেখতে পেলুম। সাড়ে তিনটের একটু পরেই একটা ছোট শহরে এসে পৌঁছলুম, সেখানে চারদিক থেকে চারটে রাস্তা এসে মিশেছে— আম্মাথি। একটি ঢাকা-দেওয়া বাস স্টপও রয়েছে, তার পাশে গোটা কতক দোকান। একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে আলাথ্ কাডের ডিরেকশন চাইতেই দোকানের সামনে দাঁড়ানো এক উদ্বিগ্ন চেহারার মাঝবয়সি লোক এগিয়ে এল, জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ব্যাঙ্গালোর থেকে আসছেন তো? আমার নাম থিমাইয়া, আমি আলাথ্ কাড এস্টেটের কেয়ার টেকার। মুথাইয়াস্যার আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে আপনারা সকালবেলা ব্যাঙ্গালোর থেকে আসবেন। এত দেরি তো হবার কথা নয়, তাই আমি আম্মাথি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলুম। আপনারা দয়া করে আমার জিপের পেছন পেছন আসুন— এস্টেট বাংলোয় আপনাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করা আছে।' অনেকক্ষণ আমাদের এত ভালো খবর কেউ শোনায়নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা একটি ছোট নালার ওপর সেতু পেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে মোরাম বিছানো পথে চল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উঁচুতে উঠে গেলাম— তার পরেই সমতল জায়গায় লাল টালির ছাদ এক বিশাল বাংলোর সামনে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল। বাড়ির সামনে চারপাঁচ জন সাদা পাজামার ওপর হাঁটু অবধি লম্বা কালো হাফ-হাতা কোট, কোমরে লাল ফেট্টি বাঁধা আর মাথায় চ্যাপটা মতন সাদা পাগড়ি-পরা লোক বোধহয় আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল- ওই নাকি কুর্গীদের সেরিমোনিয়াল পোষাক। তখন অবশ্য আমাদের ওসব ডিটেল দেখার মত অবস্থা ছিল না— গাড়ি থেকে নেমে কোনোরকমে হাতমুখ ধুয়ে সোজা খাবার টেবিলে। খাবার ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না— ভাত, চালের আটার রুটি, প্রচুর নারকেল এবং পোস্ত দিয়ে রান্না সাদা রঙের মুর্গির কারি, ফ্রেঞ্চবিনের শুকনো তরকারি তার ওপর নারকেলে কোরা ছড়ানো, সরষে ফোড়ন দিয়ে রান্না অড়হর ডাল, একটা গ্রিন স্যালাডও ছিল, শসা টোম্যাটো পেঁয়াজ স্লাইস করে কাটা আর তার সঙ্গে লেমনের টুকরো, হ্যাঁ লাইম নয়, লেমন— ওখানে ওদের গাছ ছিল। একটা পুডিংও ছিল মনে পড়ছে, গরম গরম মুগের ডালের পায়েস। সারা দিন বাদে বিকেল চারটে সাড়ে চারটের সময় সেই লাঞ্চ যে কী অপূর্ব লেগেছিল তোদের কী বলব! খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হত কিন্তু তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে বলে আমরা তখনি বাংলোর আশে

পাশের এলাকাগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। গেটের পাশেই দুটো মাঝারি সাইজের আমগাছের মতন গাছে লম্বা লম্বা বোঁটায় অজস্র বড়ো বড়ো নাশপাতির মতো দেখতে ফল ঝুলছিল— আস্‌পি দেখে বলল ওগুলো আভোকাডো পিয়ার। থিমাইয়া বলল এখানকার লোকে ওকে বলে বাটার ফ্রুট। অনেকগুলো চেরি গাছ, তাতে চেরি ফলে লাল হয়ে আছে। এমনকী নীচের জমিতেও অজস্র ফল ছড়িয়ে পড়ে আছে— একটা তুলে মুখে দিয়ে দেখি বেজায় টক, একেবারে অন্য রকমের স্বাদ। বাংলোর চৌহদ্দিতে নানা রকমের ফুলের গাছে চারদিক আলো করে রেখেছে— নানা রঙের অ্যানথোরিয়াম, জেরানিয়াম এবং নানা রঙের নানা রকমের গোলাপ— সত্যি বলতে কী আমার মধুপুরের গোলাপ বাগানের প্রথম ইন্সপিরেশনটা আমি ওখানে থেকেই পাই। একদিকে দেখলুম লম্বা কেনেলে পাঁচ-ছটা বিশাল বিশাল সাইজের ল্যাজকাটা কুকুর। থিমাইয়া বলল এদের সব রাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়— রাত্রে এস্টেট বাংলো পাহারা দেয়। চেহারা দেখে মনে হল রটওয়েলার। ওরা নাকি আগের মালিকের শিকারের সঙ্গী ছিল। এই এস্টেটের মালিক এর আগে ছিল বর্তমান মালিক মুথাইয়ার মামা। কেমন যেন মনে হল থিমাইয়া এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চায় না। এলাকাটা মনে হচ্ছিল জঙ্গলের মতই। লম্বা লম্বা উঁচু উঁচু সব অচেনা গাছপালা চারদিকে। তাদের গুঁড়ি বেয়ে গোলমরিচের লতা উঠে গেছে। উঁচুনিচু পাহাড়ি এলাকা। বাংলোর কম্পাউন্ডের বাইরেই কফির বাগান। তোরা দার্জিলিং উটিতে চায়ের বাগান দেখেছিস, কীরকম সুন্দর চারদিকে ছাঁটা ডিজাইন করা, কফি কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। কফির বাগান ঠিক যেন জঙ্গুলে ঝোপঝোপ মতন। ঘন নীল রঙের লম্বা লম্বা পাতা আর থোকা থোকা কফির বেরি ডাল থেকে ঝুলে আছে। চায়ের পাতা থেকে চা তৈরি হয়, কফি তৈরি হয় তার ফল অর্থাৎ বেরি শুকিয়ে রোস্ট করে তারপর গুঁড়ো করে। কফির ঝোপগুলো ওপরে ওপরে ঝোপড়া মতন তলাটা ফাঁকা ফাঁকা। দুদিকে কফির ঝোপের মাঝখানে দিয়ে পায়ে চলার পথটা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নামছিল। জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। থিমাইয়া বলল কাবেরীর উপনদী কাবিনীর একটি প্রশাখা এস্টেটের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে— সেখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জল জমে একটা ছোটখাট লেকের মতন হয়েছে। আস্‌পি জিজ্ঞেস করল, 'মাছ আছে? ধরা যাবে?' থিমাইয়া বলল, 'নিশ্চয়ই সার, আগের মালিক ধরতেন তো। আপনারা যদি ধরতে চান তাহলে কাল সকালে সব সরঞ্জাম বার করে দেব।' অন্ধকার হয়ে এসেছিল বলে আমরা বাংলোয় ফিরে এলুম। বাংলোর দোতলায় প্যাসেজের দুপাশে দুটি ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। বিশাল ঘর দু'দিকে দেওয়ালজোড়া কাচের জানলা, একদিকেরটা অবশ্য ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, তার বাইরে বারান্দা ছিল। যেখানে যেমন দরকার ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। খাট আলমারি সব রোজ উডের। অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম, ঠান্ডা জল, গরম জল সবেরই বন্দোবস্ত আছে। থিমাইয়া দুটো বড়ো সাইজের টর্চ এনে আমাদের দিল, বলল যদিও এস্টেটের জেনারেটরে আলো জ্বলে— তবুও যদি কোনো কারণে আলো নিভে যায় সেইজন্য। মশা যদিও নেই, তাহলেও বনজঙ্গল জায়গা। নানা রকম পোকা মাকড় আছে, জানলা না খুলে রাখাই ভালো। ওরা সবাই এস্টেট বাংলো থেকে একটু দূরে থাকে তাই সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে যায়। আমাদের যদি কোনও দরকার হয় তারজন্যে ডাইনিং রুমে কুক থাকবে— তার নাম লুইস, আমরা যেন তাকে ডাকি। ভোর হতে না হতেই থিমাইয়া ফিরে আসবে। যাবার আগে থিমাইয়া বার বার করে বলে গেল অচেনা জঙ্গল জায়গা আমরা যেন কোনমতেই রাত্রে বাংলোর বাইরে না বার হই।

সারাদিনের ক্লান্তি, আমরা তখন কোনোমতে খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানা আশ্রয় করতে পারলে বাঁচি। তাড়াতাড়ি চান টান সেরে নীচের ডাইনিং রুমে খেতে গেলুম। খাবারদাবার সব হটকেসে রাখা ছিল- সেই ওবেলার মতো চালের আটার রুটি, ডাল, বাঁধাকপির শুকনো সবজি আর কুর্গের বিখ্যাত পান্ধি কারি (শুয়োরের মাংস), মিষ্টি ক্যারামেল কাস্টার্ড। কুক লুইসের যা অবস্থা দেখলুম -সেই সন্ধে থেকেই চাঙ্গায়নি সুধা সেবন করে একেবারে টং। তার থেকে বাকি রাত্রিতে কোনো কিছু আশা করা যে বৃথা, তখনই তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়িয়ে দিকে যাব, হঠাৎ পাশের একটা ঘরের দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। লম্বা একহারা চেহারা একমাথা ব্যাকব্রাশ করা রুপোলি চুল, পরনে ভারী ব্রোকেডের ড্রেসিং গাউন— প্যাসেজের মৃদু আলোতেও বোঝা যাচ্ছিল বেশ সুপুরুষ। আমাদের দেখে বললেন, 'গুড ইভনিং, আপনারা এসেছেন শুনেছি। খুব দুঃখিত, আগে দেখা করতে পারিনি। আমি রবি, রবি জয়পাল।' ভদ্রলোকের গলার আওয়াজটা একটু ধরা ধরা মতন কিন্তু পাক্কা বিলিতি অ্যাকসেন্ট, রবির 'ব এর উচ্চারণটা একটু অন্যরকম, খানিকটা 'ব' আর 'ভ'-এর মাঝামাঝি— বুঝলুম ওটা পেট না কাটা 'ব' যেটা বাংলা বর্ণমালায় আছে বটে কিন্তু ভাষায় ব্যবহার হয় না।

আমরা নিজেদের পরিচয় দিতে ভদ্রলোক বললেন, দেখতেই পাচ্ছি আপনারা খুব পরিশ্রান্ত। আজ বরং আপনারা আরাম করুন, কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আমি আবার সকালে থাকব না। ঠিক আছে, কাল সন্ধ্যেবেলা আপনারা আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন। আমি মুথাইয়ার মামা। আচ্ছা গুড নাইট।' অভিবাদনের ভঙ্গিতে বাঁ-হাতটা একটু উচুঁ করে বাঁদিকে মোড় নিয়ে ভদ্রলোক লাউঞ্জের দিকে চলে গেলেন। দেখলুম ভদ্রলোক ড্রেসিং গাউনের ডান আস্তিনটা ফাঁকা। ভদ্রলোকের ডান হাতটা নেই— কাঁধ থেকেই নেই। মুথাইয়ার মামা। ইনি তাহলে আলাথ্ কাডের ভূতপূর্ব মালিকের ভাই-টাই হবেন, বোধহয় এখানেই থাকেন! যাক্‌গে চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল আমরা যে-যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলুম, তারপর কেনেল থেকে ছেড়ে দেওয়া কুকুরগুলোর হঠাৎ কান্নার মতন কেঁউ কেঁউ আওয়াজ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!

সকালবেলা ঘুম ভাঙল এক আজব আওয়াজে। কিট্, কিট্ কিট্ কিট্, কিট্ কিট্, কিট্ কিট্ কিট্ কিট্ কিররররর করে এমন বিকট আওয়াজ শুরু হল যে কানে তালা লেগে যাবার যোগার। আওয়াজটাও এমন যে কম ডেসিবেলে শুরু হয়ে ক্রমাগত তার জোর বাড়তে থাকে। মনে হল ক্রমে, যেন চারদিকে থেকে হঠাৎ এক ভয়ানক কোরাস শুরু হয়েছে। কীসের এমন ডাক? কোনো পাখি? না জানোয়ার? পাশের ঘরে গিয়ে দেখি আদাজানিয়াও উঠে পড়েছে। সে ও বলল যতীন এ কীসের শব্দ রে বাবা — এমন ডাক তো কোনো পাখির সাতজন্মে শুনিনি!' যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেদিকের জানলার পরদা সরিয়ে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো খুলে বারান্দায় বেরিয়েও আশেপাশে সে আওয়াজের উৎস খুঁজে পাওয়া গেল না। খালি চোখে ধারে কাছে এমন কোনো পশুপাখি নজরে এল না যে ওই রকম বিচ্ছিরি আওয়াজ করতে পারে। ঠিক সেই সময় বারান্দার কাছাকাছি একটা গাছের ফাঁকা গুঁড়ির ওপর থেকে সেই আওয়াজ আবার শুরু হল। আস্‌পির টেলিফোটো লেন্স এনে কীসে যে সেই আওয়াজটা করছে দেখতে গিয়ে হাসব কি কাঁদব বুঝে উঠতে পারলুম না। ওই বীভৎস কোলাহলের সৃষ্টিকর্তা একটি ইঞ্চি দেড়েক মাপের আজব প্রাণী— পশু নয় পাখি নয়, একমেবদ্বিতীয়ম একটি ঝিঁঝিপোকা— যাকে 'সিকাডা' বলে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখা গেল, পোকাটার পেছনের পা দুটো তুলনায় অনেক লম্বা, এবং এই শব্দটা সেটা করছে পেছনের পা এবং ডানা দুটো ঘষে ঘষে। একটা এইটুকু পতঙ্গ যে এই রকম ভীষণ জোরে শব্দ করতে পারে স্বচক্ষে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। আদাজানিয়া অবশ্য সেই বিভীষণ ঝিঁঝিপোকার বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেছিল।

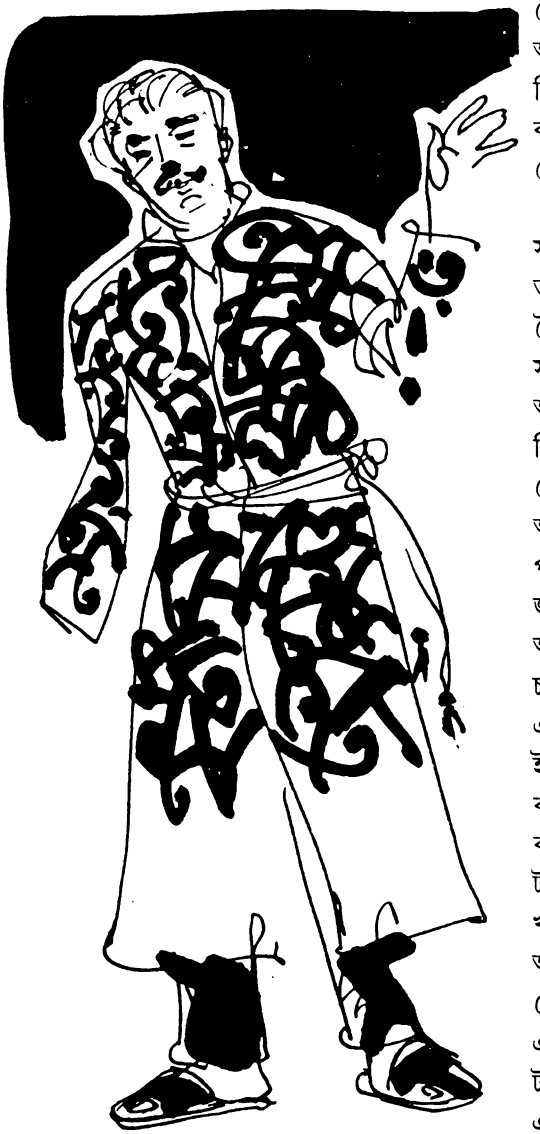

গরম গরম চা বিস্কুটের সঙ্গে থিমাইয়াও এসে গেল। তাড়াতাড়ি চানটান করে তৈরি হয়ে নিয়ে ইডলি সাম্বর, ফ্রাইড এগ্‌স, টোস্ট আর এস্টেটের কমলালেবু দিয়ে তৈরি মার্মালেড দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা আলাথ্ কাড দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। বাহাত্তর একর জায়গা জুড়ে রোবাস্টা আর অ্যারাবিকা দুরকম কফির চাষ, গোলমরিচের চাষ, ছোট এলাচ, সুপুরি, কমলালেবু ইত্যাদি বাগান। থিমাইয়া বলল। এই এস্টেট থেকে বছরে কমপক্ষে আট-ন লক্ষ টাকা রোজগার হয়। খরচাপাতি বাদ দিয়ে। আমি আর আদাজানিয়া দুজনেই বেশ অবাক হলুম। এগ্রিকালচারের ওপর কোনো ট্যাক্স নেই। যা দেখছি, এস্টেটের কর্মচারীরাও

মোটামুটি ভালই কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তা হলে মুথাইয়া এ এস্টেট বেচতে চাইছে কেন? থিমাইয়াকে জিজ্ঞেস করতেও বিশেষ কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। বলল, মালিকের মর্জি। তিনি সপরিবার বরাবরই ব্যাঙ্গালোরে থাকেন, ছেলেমেয়েরা বিদেশে। তার তাছাড়া এই এস্টেট মুথাইয়ার মামার সম্পত্তি ছিল, উনি পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। আদাজানিয়া আমাকে বলল, যতীন, এ রকম লাভজনক কফি এস্টেট মুথাইয়া যে দামে বেচতে চাইছে সেটা প্রায় দায়ে পড়ে বেচে দেওয়ার দাম, কোনো গণ্ডগোল নেই তো? আমাদের মারকারা গিয়ে ল্যান্ড রেভিনিউ-এর অফিসে একটু খোঁজখবর করা উচিত।' আমারও মনে হল সেটাই ঠিক হবে। তখন সকাল প্রায় দশটা বেজেছিল, মারকারা আলাথ্‌কাড থেকে আঠাশ কিলোমিটার, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। সুতরাং আমরা বাংলায় ফিরে নিজেদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে মারকারার উদ্দেশে রওনা হলুম। জিনিসপত্র সঙ্গে নেবার কারণ ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আদাজানিয়া তার দামি ক্যামেরা,বন্দুক ইত্যাদি অজানা জায়গায় ফেলে যেতে চাইছিল না। থিমাইয়া জয়াকুমারকে ল্যান্ড রেভিনিউ আপিস যাবার রাস্তা বাতলে দিল। বেরোবার সময় থিমাইয়াকে বললুম আমাদের ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে- সন্ধেবেলাতে অবশ্য মুথাইয়ার মামা মিস্টার জয়পাল আমাদের ডিনারের নেমতন্ন করেছেন। আমার কথা শুনে থিমাইয়া মুখে কিছু বলল না বটে কিন্তু মনে হল হঠাৎ যেন ওর মুখটা হাঁ হয়ে গেছে আর গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়েছে— অবাক গোল গোল চোখে ও আমাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

মারকারার পথে আমরা ভন্টিয়ানগাদি বলে একটা ছোটখাটো জনপদ পার হলুম। সেখান থেকে আরও তিনচার কিলোমিটার আগে দেখি একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ি ঘুরে ঘুরে ওঠা পথ বলে গাড়িটা বেশ আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল। মনে হল বোধহয় কোনও কারণে খারাপ হয়েছে। বনেট খুলে ড্রাইভার কিছু করছে, পাশে আর একজন লোক দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি গিয়ে দেখি ভদ্রলোক হচ্ছেন সেই ডা. শিবরাম, ফরেস্ট রেঞ্জার, যাঁর সঙ্গে কাল আমাদের টাট্টাগুপ্পেতে আলাপ হয়েছিল, আমাদের দেখে যেন ভদ্রলোক হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন পথে জিপ খারাপ হয়ে সমুহ বিপদে পড়েছেন। ওঁর মারকারা যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন অথচ গত দেড় ঘণ্টা ধরে এ পথে একটিও গাড়ি আসেনি। আমরাও মারকারা যাচ্ছি এবং আনন্দের সঙ্গে তাঁকে লিফ্‌ট দেব জেনে তো ভদ্রলোক মহাখুশি। বললেন অনেকদিন চেষ্টার পরে গতকাল সন্ধেনাগাদ সেই একদেঁতো দুষ্টু হাতিটা ধরা পড়েছে- মাঝ রাত্তিরে সেটাকে কড়া ডোজে ঘুমের ইঞ্জেকশন-টন দিয়ে দুবারে ক্যাম্পে নিয়েও যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্যাম্পে পৌঁছে তিনি দেখেন যে সেদিনই ওপর থেকে হাতিটাকে মেরে ফেলার নির্দেশ এসেছে— এখন মারকারা গিয়ে কনজারভেটরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে কোনোরকমে সেই অর্ডারটি ক্যানসেল না করাতে পারলে তাঁর এতদিনের পরিশ্রম পণ্ড হবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আরকের নেশা ছাড়াতে পারলে হাতিটা একদম নর্মাল হয়ে যাবে। কিন্তু আশঙ্কার কথা হচ্ছে এই যে দু'বছর আগে কফি প্ল্যান্টার রবি জয়পালকে নৃশংসভাবে মেরে ফেলার পর থেকেই হাতিটার বিরুদ্ধে বিশেষ করে ওপর মহলে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে। ডা. শিবরামের কথা শুনে আমি আর আদাজানিয়া দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম 'কী নাম বললেন? রবি জয়পাল?' ডা. শিবরাম বললেন, 'সে কী আপনারা জানেন না? আপনারা তো আলাথ্‌ কাডেই উঠেছেন। আলাথ্‌ কাড রবি জয়পালের অনেক সাধের এস্টেট। আর অপঘাত মৃত্যুর পর অন্য ওয়ারিশ না থাকায় তার ভাগ্নে এখন মালিক হয়েছে। জয়পাল এ অঞ্চলে উদার হৃদয় অতিথি বৎসল বলে প্রসিদ্ধ ছিল। কী সুন্দর বাংলোটি বানিয়েছে দেখেছেন তো?'

আমাদের গাড়ি ততক্ষণে মারকারা পৌঁছে গেছে। ডা. শিবরাম কে কনজারভেটর অফ ফরেস্টের আপিসে নামিয়ে আদাজনিয়া বলল 'চ্যাটার্জি আর বোধহয় ল্যান্ড রেভিনিউ অপিসে যাবার দরকার নেই। কপাল গুণে মালপত্র সব সঙ্গেই আছে। এখান থেকে সোজা ব্যাঙ্গালোর। ফেরবার পথে আর ভন্টিয়ানগাদির রাস্তা না ধরে আমরা, সেই যেখানে আজ কাল তিব্বতিদের আখড়া হয়েছে, সেই কুশলনগর হয়ে হুনসুরের পথ ধরলুম। আলাথ্‌ কাডে আর ফেরা হল না। জানতুম ফিরে গেলে সন্ধের ঝোঁকে প্যাসেজের পাশের ঘর থেকে ব্রোকেডের ড্রেসিংগাউন গায়ে, মাথায় একমাথা ব্যাকব্রাশ করা রুপোলি চুল, লম্বা একহারা চেহারার রবি জয়পাল বেরিয়ে আসবেন। বলবেন, 'ওয়েল কাম ব্যাক টু আলাথ কাড।' খুব সম্ভবত শেক হ্যান্ড করার জন্যে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেবেন, ড্রেসিং গাউনের ডানহাতের ফাঁকা আস্তিনটা কাঁধের কাছ থেকে ঝুলবে।

ছবি : দেবব্রত ঘোষ

ভুতুম : ভুতের ছানা
কর্তা : ভুতুমের বাবা
গিন্নি : ভুতুমের মা
পল্টু : ভুতুমের বন্ধু
বিল্টু : ভুতুমের বন্ধু

গিন্নি : মাখছে রং
পুব আকাশ
রাত্রি শেষ
সর্বনাশ!
ভূত ভুতুম
ভূত সোনা
তাও তো ঘর
ফিরল না।

কর্তা : বাড়িতে আসবে আঁধার থাকতে বাকি
আমাদের ভুতুম সুবোধ তেমনি নাকি!
দ্যাখোগে কোথায় কাদের বাড়ির ছাতে
মেতেছে মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়াতে।
দিনদিন হচ্ছে ব্যাটা ঘোর বেয়াদব
জুটেছে তেমন গুণের বন্ধুরা সব।

গিন্নি : সঙ্গদোষ!
তাই দেখি—
হয় এ হাল
নইলে কী!
ভূততলার
কেল্টে আর
ঘোঁতনা ভূত
এই পাড়ার
দুইজনাই
মুখ্যু ঘোর
সেই ওরাই
বন্ধু ওর।

কর্তা : এদিকে কালকে ক্লাবের কম্পিটিশন
যতসব ভূতছানারা ব্যস্ত ভীষণ।
কে কেমন জ্যান্ত মানুষ সাজতে পারে
আছে ঢের মেডেল, প্রাইজ তার বিচারে।
ছেলেকে বোঝাই যত— 'ভুতুম ওরে
প্রাণপণ খাটতে হবে সত্যি করে।
অবিকল মানুষ সাজা নয়তো সোজা,
প্রথমেই উচিত নানা তথ্য খোঁজা—
মানুষের হাত-পা-মাথার কেমন গড়ন
কী রকম চলন বলন আর আচরণ
চটপট চেষ্টা করে ফেল্ তা শিখে—'
তা ছেলের হুঁশ কি আছে সেসব দিকে!

গিন্নি : বাঁশবনের
পেত্নী সই
মেয়েটা তার
স্মার্ট বড়ই।
সাঁঝবেলায়
আজ দেখি—
সেই মেয়ের
সাজ সে কী!
ছিট জামায়
রং বেরং
ঠিক নিখুঁত
মানুষ সং।
ভূত-মেয়ের
সাজ দেখে
নয় মানুষ,
বুঝবে কে!

কর্তা : সেখানেই চিন্তা আমার, বুঝছ না কি!
ভুতুমই দেখছি শুধু দিচ্ছে ফাঁকি।
অতীতে মানুষ মনস্তত্ব ঘেঁটে
করেছি রিসার্চ আমি মস্ত খেটে।
বুঝিবা এসেই যেত নোবেল হাতে—
হল না একটু অসম্পূর্ণতাতে।
পারিনি জ্যান্ত মানুষ করতে স্টাডি,
ওরা তো আমায় দেখেই দাঁত কপাটি।
সে যা হোক, সবাই জানে আমার কথা—
মানুষের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা।
সে আমার পুত্র হয়ে ভুতুম শ্রীমান
যদি ওই "মানুষ সাজো"য় নামটা ডোবান
লজ্জায় পড়বে কাটা মোর মাথাটা
সকলে বলবে তখন "কন্ধকাটা"।

গিন্নি : ওই ভুতুম
ঠেলছে দোর
রাত তো শেষ
হচ্ছে ভোর।

ভূতুমের প্রবেশ

গিন্নি : ফিরতে ঘর
রাত কাবার
বাপ মায়ের
চিন্তাই সার।
মরছি স্রেফ
তোর জ্বালায়
বল্, ছিলিস
কোন চুলায়?

ভুতুম : কালকে ক্লাবের 'মানুষ সাজো'য়
নামছে সকল ভূত-ই
সমস্ত রাত আমি তারই
নিলাম মা প্রস্তুতি।
সাজটা আমার সাঙ্গ হলে
মুখ দেখেছি ডোবার জলে
বলব কি আর! মানুষ কেন,
লাগছিল দেবদূত-ই।
শ্যাওড়া গাছের পিছনপানে এই যে পোড়োঘর
মানুষ সেজে ঘুরতে গেলাম সেইখানে তারপর।
ভূতবাড়িতে যেই না ঢোকা
দুজন দেখি মানুষ খোকা
টর্চ জ্বালিয়ে ঘুরছে ওরা—
নেই কিছু ভয়ডর।
ওদের কথা লুকিয়ে শুনে আঁচটা পেলাম এই
কাটাচ্ছে রাত করতে পরখ ভূত আছে কী নেই।
ঠিক করলাম মানুষ বেশে
ভাব জমাব সামনে এসে
মানুষ-ভূতে দোস্তি হতে পারবে তাহলেই।

কর্তা : কী বলিস! তার মানে তুই মানুষ সেজে
মানুষের চোখেও ধরা পড়লি নে যে।
তবে আর কালকে তোকে আটকাবে কে!
দেখেছ গিন্নি? বলে সাহস একে।

ভুতুম : ওই ইয়ে... ঠিক তা নয় বাবা, একটা ছিল ভুল
তখন আমি মানুষ সাজার আনন্দে মশগুল।
তাইতো খেয়াল হয়নি আগে
ঠ্যাংদুটো যে উল্টোবাগে
স্ক্রু খুলে তা উল্টে নিতে ভুল হল বিলকুল।

গিন্নি : ভূত ভুতুম
ভূত খোকা
তোর মতন
নেই বোকা।

ভুতুম : শোনোই না মা, আমায় দেখে ওদের তো হাড় হিম
মুখেই যত বীরত্ব মা, দুটোই ভিতুর ডিম।
মুচ্ছো গেল একটা ছেলে
অন্যটা ছুট দরজা ঠেলে,
অমনি আছাড় ধপাস করে, মুণ্ডুটা ঝিমঝিম।
তখন আমি সামনে গিয়ে অভয় দিলাম ঢের
'ভয় পেয়ো না, চাই হতে স্রেফ বন্ধু তোমাদের'
সাহস কী আর পায় প্রথমে?
তাও হল বন্ধুত্ব ক্রমে
সমস্ত রাত হই হল্লায় চলল তারই জের।
দুজন ছেলেই খুব ভালো মা, খুব হইচইবাজ
তাই বলেছি আসতে ওদের আমার বাড়ি আজ।
হল ওরা নিমরাজি মা
আমার খুশির নেই তো সীমা
ওদের কাছেই শিখব আমি সঠিক মানুষ সাজ।

কর্তা : সে তো বেশ মানুষঘরের জ্যান্ত ছেলে
তোরই লাভ ওদের মতন বন্ধু পেলে।
জুটিয়ে সঙ্গী ওসব কেল্টে ঘোঁতন

ক্রমশ হচ্ছিল তোর অধঃপতন।
এবারে মানুষ ছানার সঙ্গে মিশে
শোধরাস একটু যদি, মন্দ কী সে!

দরজার শব্দ

ভুতুম : ওই দেখ দোর ঠেলছে ওরা—
খুলতে হবে খিল
বেফাঁস কথা কিন্তু মাগো
বলবে না একতিল।
দুটোই নেহাৎ মানুষছানা
ভূত কী রকম নেই তা জানা
ভয় যদি ফের পায় তোমাদের
তবেই তো মুশকিল।

ভুতুমের মায়ের গিয়ে দরজা খুলে দেওয়া এবং দুটি ছেলের প্রবেশ

গিন্নি : আয় রে আয়
আয় ভিতর—
পাসনি কেউ
মিথ্যে ডর।
দেখছি দুই
ভাই তোরা—
খুব লাজুক
মুখচোরা?
দেখলে মুখ
প্রাণ জুড়ায়—
ভয় কিসের?
সামনে আয়।

বিল্টু : সত্যি তবে এলাম ভূতের বাড়ি
আমরা দুজন দেখছি দারুণ লাকি,
বিল্টু আমি, পল্টু আমার ভাই
ওই ওপাশের মানুষপাড়ায় থাকি।

পল্টু : ছিলই কাছে ঠিক ঠিকানা
রাস্তা তবু নেইতো জানা
ভূতপাড়াতে দিইনি আগে
পা!
শ্মশান মশান সব পেরিয়ে
পৌঁছেছি তাও প্রাণটা নিয়ে
শিরশিরিয়ে কাঁপছে তবু
গা!

কর্তা : আহাহা সোফায় বসে নাও জিরিয়ে
চটপট আসছি আমি পেনটা নিয়ে।
কর না রিল্যাক্স, ভাবো নিজের ঘরই
আমি তো মানুষ নিয়েই চর্চা করি।
শুধাব দুচার কথা, এ নোটবুকে
তোমাদের জবাব সবই নিচ্ছি টুকে।
সাধারণ মানুষছানার খাদ্যরুচি
কীরকম? ভাত-স্প্যাগেটি-কেক না লুচি?
"বেটিং"-এর অর্থ জান? "স্লেজিং"টা কী?
বিশ্ব কাপের ফিভার কোনো ব্যারাম নাকি?

গিন্নি : হয়েছে ঢের
প্রশ্নবাণ
বাচ্চাদের
দাও ছাড়ান।
একটু নয়
হাঁফ ছাড়ুক
দুইজনার
শুকনো মুখ।
বিল্টু, বোস
বল কী খাস
মাছ পচার
টাটকা আঁশ?
পল্টু তোর
চাই কী ঠিক—
হিংপোড়ার
স্যুপ খানিক?

ভুতুম : মাছপচা আর হিংপোড়া সব অদ্ভুতুড়ে ডিশ
এসব খানা ওদের মুখে রুচবে নাকি— ইস্।
মানুষ-খাবার রাঁধতে জানো?
তাই তাহলে একটু আনো
পোলাও-পায়েস-চিকেন কারি কিংবা চিলিফিশ।

বিল্টু : মিথ্যে কেন জ্বালাস কাকিমাকে
নেই আমাদের তেষ্টা খিদের লেশ
তার চেয়ে নয় আড্ডা দিতে বসি
ভূত-মানুষে গল্প জমুক বেশ।

পল্টু : মানুষঘরের কোপ্তা-কিমা
আজকে ওসব থাক কাকিমা
ওসব খাবার খাচ্ছি দুভাই রোজ।
এলাম যখন ভূতের বাড়ি

ট্রাই করি না ভূত-খাবারই
নতুন স্বাদেই উঠুক জমে
ভোজ।

গিন্নি : বেশ তো বেশ
আয় রে-বোস
আনছি সব
একটু রোস।

প্রস্থান এবং দুটি খাবারের প্লেট এনে দুজনের হাতে প্রদান

বিল্টু : (খেতে খেতে) :
উপচিয়ে প্লেট খাবার এসব কত!
পদ কত কী— কিচ্ছু তো নেই বাদ,
মানুষপাড়ায় নেই তো কারও জানা
ভূত-খাবারের এমনি দারুণ স্বাদ!

পল্টু : (খাওয়া শেষ করে) :
দেখতে এলাম ভূতের বাসা
খাবার খেলাম দিব্যি খাসা
দিনটা তো আজ কাটল মজায়
বেশ।
এবার তবে যাচ্ছি চলে
ফের কখনও ইচ্ছে হলে
আবার এসে ঘুরব ভূতের
দেশ।

কর্তা : সে কী হে! এই এখনই উঠতে হবে?
তাহলে যাও বলে ফের আসবে কবে।
তোমাদের করতে স্টাডি পারলে এবার
বানাব দারুণ সে এক রিসার্চ পেপার।
তা দেখে ভূতমহলে পড়বে সাড়া—
বল ফের আসছ কবে এই এপাড়া।

পল্টু : অভয় যদি দেন তাহলে
একটা কথা যাচ্ছি বলে
আমরা তো নই মানুষঘরের
পো!
মানুষ সাজার ছিলই তো শখ
বিদ্যেটা তার করতে পরখ
হঠাৎ করেই আজকে পেলাম
জো!

বিল্টু : কেল্টে ও যে, ঘোঁতনা হলাম আমি
"মানুষ সাজো"য় নামছি দুজন কাল,
দুই ভূতে তাই মানুষ খোকার বেশে
সমস্ত দিন দিচ্ছি রিহার্সাল।

গিন্নি : সর্বনাশ!
যাই কোথায়
তোমরা ভূত?
হায় রে হায়।

পল্টু : এমনি মানুষ সাজটা দেখে
আর আমাদের আটকাবে কে
মেডেল, প্রাইজ জুটবে সবই
ঢের।
আজকে তবে আসছি- টা টা
ভুতুম ওরে, দে দরজাটা।
সুযোগ পেলেই আসব চলে
ফের।

যবনিকা পতন **ছবি : দেবাশীষ দেব**

কমান্ডার বোস

কল্পনাও ছবি – গৌতম কর্মকার

এসো বন্ধুগন এসো··· গ্রহন করো আমাদের মহাকাশযান। তোমাদের সেবায় ধন্য হোক আমাদের জীবন।
সেই অদ্ভুত আলো! কী আশ্চর্য অনুভূতি! মনের জগতে আলোড়ন শুরু হয়েছে কী ঘটতে চলেছে কে জানে···
অতীতের ছবি ভেসে আসছে।
শিশু কালের কথা, কিশোর বয়সের কথা, ইনসার ট্রেনিং···
চাঁদের মহাকাশ উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে আমরা তিন নক্ষত্র উপনিবেশের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম মহাবিশ্বে— কেন জানি না সব স্মৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মনের পর্দায় ফুটে উঠছে।
FRIENDSHIP
আমাদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রন করে সবকিছু জেনে নিচ্ছে। কী অসাধারন ক্ষমতা!

অদ্ভুত… অদ্ভুত জগতের ছবি চোখে ভাসছে। ঝকঝকে নীল আকাশ, চারপাশে প্রকান্ড প্রকান্ড ইমারত। কঠিন দেওয়ালের গা বেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে আশ্চর্য বাসিন্দারা।
Goulam

সব ছবি হারিয়ে গেল। বুঝেছি, যে জগতের ছবি দেখলাম সেটি এদের পৃথিবী।

জীবগুলোর সাথে কোন অস্ত্র দেখছিনা। অথচ কেমন অবলীলায় জয় করে নিল আমাদের বিজ্ঞানের যাবতীয় দম্ভ! আমাদের নিয়ে কি করবে এরা?

স্পেসশিপের এতো মারনাস্ত্র, এতো অ্যাস্ট্রোওয়ের, কোন কাজে লাগলোনা। আর ভাবতে পারছিনা, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে… স্লিপিং ইউনিটে যেতে হবে।

মালো, এমারসন- সবাইচলেছে!
আমাদের ঘুম পাড়িয়ে এরা স্পেসশিপের কলোনি নিজেদের হাতে তুলে নেবে- কী ভয়ানক।

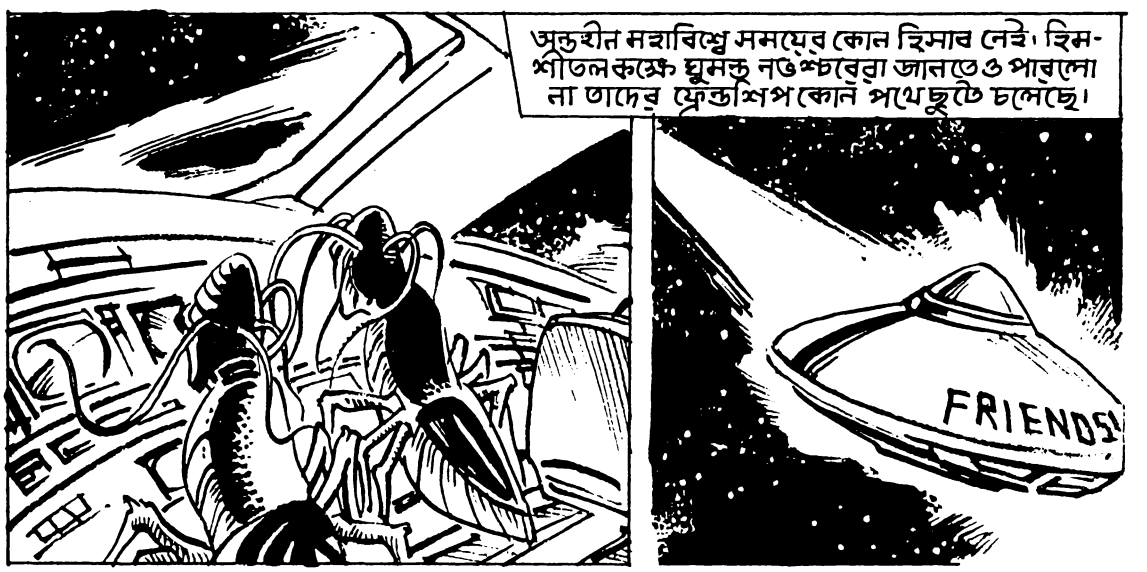

শরীর অসাড় হয়ে আসছে। সামান্যতম বাধাও আমরা দিতে পারলাম না!
ঘুম নামছে·· জানি না এ ঘুম কোনদিন ভাঙবে কিনা!
বিবর্তনের কী অবিশ্বাস্য সৃষ্টি। কতো সহজে এরা শিখে নিল ফ্রেন্ডশিপের যাবতীয় কন্ট্রোল!
অন্তহীন মহাবিশ্বে সময়ের কোন হিসাব নেই। হিম-শীতল কক্ষে ঘুমন্ত নভশ্চরেরা জানতেও পারলো না তাদের ফ্রেন্ডশিপ কোন পথে ছুটে চলেছে।
FRIENDS
সিউডো ব্রেনের ট্রাঙ্কুইলাইজিং ইউনিট তার কাজ শেষ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। ডাঃ স্ফিংসের জেগে ওঠার সময় হয়েছে।
বেশ তো ছিলাম, হঠাৎ দুর্জয় আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল কেন?
ক্রমশ

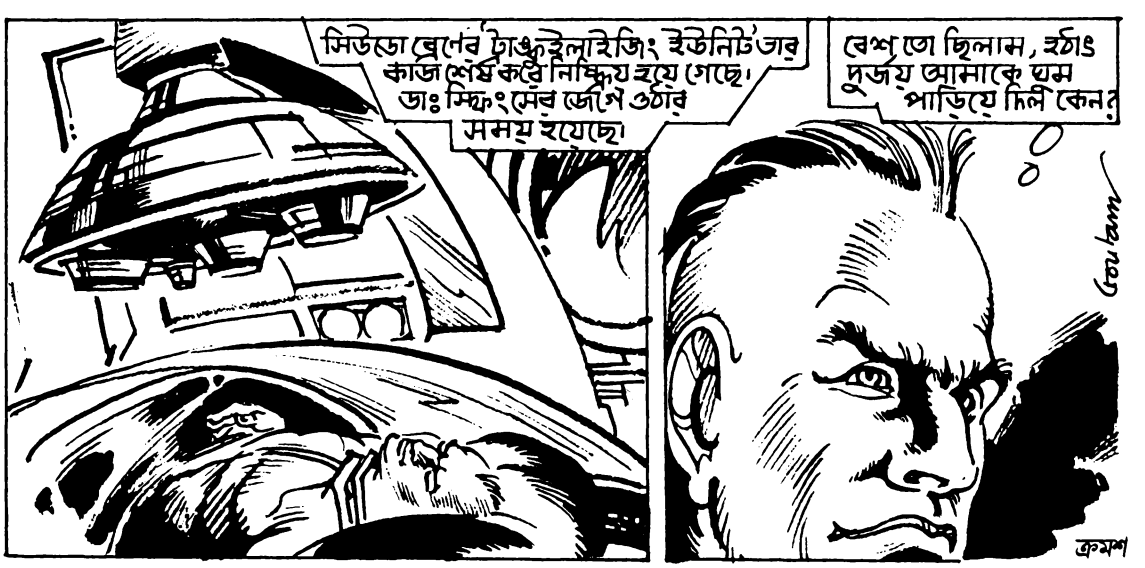

আগে যা ঘটেছে

আট বছর বয়েসি রূপু বেড়াল ভালোবাসে। একদিন বৃষ্টিতে ভেজা এক বেড়াল-বাচ্চাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে পড়ল ট্রাকের সামনে। আর দুর্ঘটনার পরেই রূপু দেখে কীভাবে যেন বেড়াল হয়ে গেছে সে! বেশ কিছু ভয়ানক ও মন্দ অভিজ্ঞতার পরে বেড়ালরূপী রূপুর একটা বিরাট প্রাপ্তি ঘটল— জেনি ওরফে যমুনাকে বন্ধু হিসাবে পাওয়া। তার কাছে রূপু যেমন আশ্রয় পেল, তেমনি বেড়াল-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠও শিখে নিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যমুনা রীতিমতো মেম-ঘেঁষা। ওর মা-র দিদিমার দিদিমার দিদিমা ছিল দার্জিলিং-এ এক সাহেবের আশ্রয়ে। দিদিমা কলকাতার সাহেব পাড়ায় আর ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। ওর মালিক বাড়ি বদলানোর সময় যমুনাকে ভুলে চলে গেলে ক্ষুব্ধ যমুনা সেই থেকে রাস্তায়।

গঙ্গায় ডুবন্ত যমুনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে রূপু আর যমুনার বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়। এবার দু'জনে মিলে রাতের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে লুকিয়ে চলল দার্জিলিং, যমুনার স্বজনের খোঁজে। কিন্তু প্রাকৃতিক শোভা মন ভোলালেও দার্জিলিং-এর বাকি অভিজ্ঞতা হল বেজায় খারাপ। একদিকে, উন্নাসিক মাসি যমুনাকে আত্মীয় বলেই স্বীকার করল না। অন্যদিকে রাতের আশ্রয় গুদাম ঘরে আগুন লাগলে কিছু মানুষের দয়ায় কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচল ওরা। শেষমেশ, দু'জনেই সিদ্ধান্তে এল আর এখানে নয়, আপনার জায়গা— কলকাতাতে ফেরা জরুরি। কলকাতায় ফিরে প্রথমেই ওরা গেল বুড়ো শিউপূজনের কাছে। শিউপূজন তাদের কী ভালোই না বাসত। কিন্তু এসে দেখল যারা গেছেন সেই বৃদ্ধ মানুষটি।

বারো : বাড়ি ফেরা

স্ট্র্যান্ড রোড থেকে সোজা দু'জনে গড়ের মাঠে এল। রাত তখন নটা। দু'জনে পাশাপাশি চুপচাপ বসে রইল। মন ওদের ভারী। খানিক বাদে রূপু বলল, 'আমার মা বলতেন কারুর মনে শুধু শুধু কষ্ট দিতে নেই। বিশেষ করে বুড়ো মানুষদের। তাঁরা চলে গেলে স্যরি বলবারও সময় পাওয়া যায় না।'

যমুনা বলল, 'একদম ঠিক। কিন্তু আমরা তো বুড়ো মানুষটিকে কষ্ট দিতে চাইনি, শুধু ঘরে বন্দি হতেও চাইনি।'

একটা গাছের ডালে ওরা সে রাতটা কাটাল। খাওয়া জোটেনি ওদের, কিন্তু কারুর সে কথা মনেও হয়নি। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল আর বাড়ির কথা মনে পড়ছিল রূপুর। ওর মা একটা গান শুনতেন প্রায়ই, 'মরুতীর্থ হিংলাজ' সিনেমার গান— 'পথের ক্লান্তি ভুলে...'

পরের দিন সকালে রূপু বলল খুব আস্তে, 'একটা কথা বলব?'

'বলো না', আশ্বাস দিল যমুনা।

রূপু বলল, 'একবার আমাদের বাড়িতে যাবে? বাবা-মাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে। যদি বাড়িতে ঢুকতে নাও পাই, তবু...।' গলাটা বুজে এল রূপুর।

যমুনা বলল, 'নিশ্চয়ই, তাই চলো'।

রূপু বলল, 'কিন্তু যাব কেমন করে? এতটা রাস্তা তো আমি চিনি না। ২৪ নম্বর ট্রাম বা ট্যাক্সিতে এখান থেকে যাওয়া যায়, কিন্তু সে রাস্তা তো আমাদের কাছে বন্ধ।' যমুনা বলল, 'দূর বোকা! বেড়ালরা কখনো রাস্তা ভোলে? তুমি যে পথে যেমন করে এসেছ, ঠিক সেই পথে চল। দেখো, ঠিক পৌঁছে যাব।'

রূপুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, আমিও হর্ষবর্ধন-গোবর্ধনের গল্পে তাই পড়েছি। সে গল্প জান তো? হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন দুই ভাই। গোবর্ধনের বৌদি অর্থাৎ হর্ষবর্ধনের বউ মোটেই বেড়াল দেখতে পারে না। মানে আমার আয়াদিদির মতন আর কী! এদিকে ওদের বাড়িতে এক বেড়ালছানা আশ্রয় নিয়েছে। বউদির তাড়নায় গোবর্ধন তাকে থলিজাত করেছে। ছেড়ে দিতে হবে অনেক দূরে, কারণ নইলে বেড়াল পথ চিনে ফিরে আসবে। গোবর্ধন তাই করেছে। ট্যাক্সি, ট্রেন, বাস, রিক্সা বদল করে বহু দূরে এক মাঠের মধ্যে বেড়ালছানা ছেড়েছে। ওদিকে নিজেরই পথ গুলিয়ে গেছে। অনেক রাত হয়ে গেল, গোবরা ফেরে না, দাদা-বউদি ভীষণ চিন্তিত। শেষে মাঝ রাতে ধুলি ধুসরিত অবস্থায় গোবরা ফিরল। ফিরল কী করে? না, ওই বেড়ালছানারই পিছু পিছু পথ চিনে।'

হেসে যমুনা কুটোপাটি। সে হাসিতে ওদের মনের গ্লানি যেন অনেকটা কেটে গেল। তারপর যমুনা বলল, 'ঠিক। ওইরকম ভাবেই যাই চলো।'

রূপু-যমুনা দু'জনে মিলে এদিক-ওদিক ঘুরে মনুমেন্টের তলা দিয়ে গড়ের মাঠ পেরোল। চৌরঙ্গি পেরিয়ে লিন্ডসে স্ট্রিট দিয়ে নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে এসে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট। তারপর ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে পুরোনো বইয়ের দোকান ছাড়িয়ে পার্ক স্ট্রিট। পার্ক স্ট্রিট পেরিয়ে রাসেল স্ট্রিট। ডাইনে বেঙ্গল ক্লাব আর বাঁয়ে সাটন সীড-এর দোকান ছাড়িয়ে গুদামটার সামনে এসে যমুনা বলল, 'আমার কত দিনের আশ্রয়স্থল!' রূপু বলল, 'আমার স্কুলও বলতে পার।' দু'জনেই দেখল দরজার নীচটা এখনও ভাঙা, যেখান দিয়ে ওরা যাওয়া আসা করত।

এবার রূপুর পথ চেনার পালা। রাসেল স্ট্রিট, মিডলটন স্ট্রিট, লিটল রাসেল স্ট্রিট দিয়ে ওরা এল থিয়েটার রোডে। একটু ভেবে থিয়েটার রোডে ডাইনে বেঁকল রূপু, এবার লর্ড সিন্‌হা রোড ধরল। এমামি মার্কেটের সামনে এসে রূপু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এখানে ল্যান্ডমার্ক-এর বইয়ের দোকান। কতবার এসেছি মা'র সঙ্গে।' তারপর লোয়ার সার্কুলার রোডের নতুন তৈরি বিরাট ফ্লাই ওভারের নীচ দিয়ে গেল বড়ো রাস্তায়। এবার এলগিন রোড আর সারি সারি লক্ষ্মীবাবুর আসল সোনা-চাঁদির দোকান পেরোল। রূপু বলল, 'আশ্চর্য! সবগুলোই আসল লক্ষ্মীবাবুর দোকান। তাহলে নকল কোনটা?'

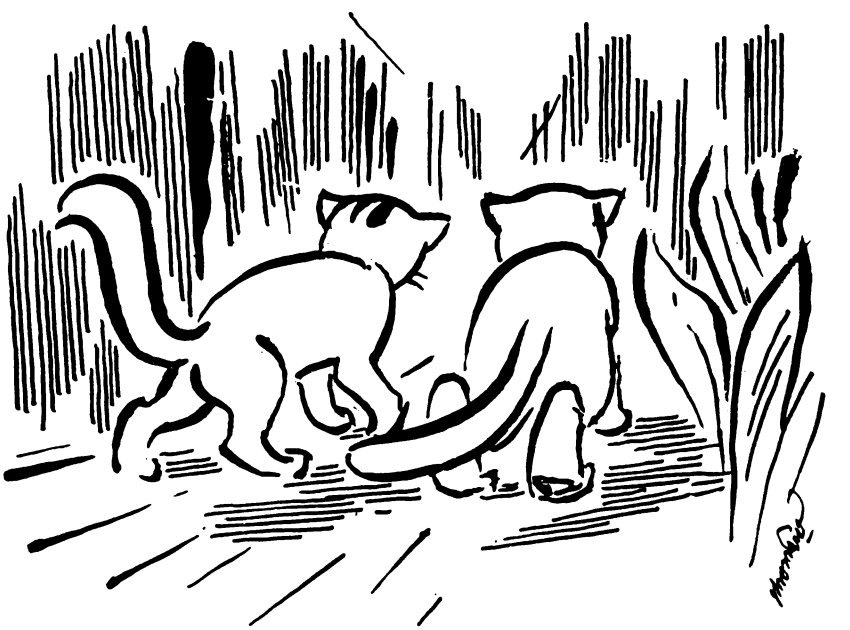

আরেকটু এগিয়ে ওরা পৌঁছল গাঁজা পার্কে। সেখানে আবার বড়ো রাস্তা ছেড়ে যদুবাবুর বাজারের পিছন দিয়ে পদ্মপুকুর, চক্রবেড়িয়া, টাউনসেন্ড রোড ধরে শেষ পর্যন্ত হাজরা রোডে পৌঁছল ওরা। কালীঘাট পার্কের পিছনে সতীশ মুখার্জি রোড ধরে রাসবিহারী এভিনিউ পৌঁছতেই রূপু দেখল আর কষ্ট করতে হচ্ছে না। সব চেনা রাস্তা। সহজেই লেক মার্কেট ছাড়িয়ে লেক রোডে ঢুকল ওরা। এবার রূপু প্রায় দৌড়চ্ছে। মাকে একবার দেখার ইচ্ছা তখন প্রবল, তা সে মা চিনতে পারুক আর না পারুক।

যমুনা ওকে সতর্ক করছিল, 'রূপু, একটু দেখে চলো। দৌড়িওনা।' তা সত্ত্বেও রূপু এক দৌড়ে ওদের ১৬ নম্বর বাড়ির সামনে হাজির হল। এ কী? বাড়ির সব দরজা-জানলা সপাটে বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। তবে কী এ বাড়ি ছেড়ে সবাই অন্যত্র চলে গেল! কিন্তু দরজার নেম-প্লেটে জ্বলজ্বল করছে ক্যাপ্টেন এ. কে. চক্রবর্তী মিসেস মনিকা চক্রবর্তী।

একটা হতাশা যেন রূপুকে গ্রাস করল। থাবায় মাথা রেখে সে ফুটপাথেই শুয়ে পড়ল। যমুনা সেই মুহূর্তে তার খড়খড়ে জিভ দিয়ে ওকে চাটতে লাগল। রূপু টের পেল সে আর একা নয়, তার সঙ্গে তার প্রিয় বন্ধু আছে। মা-বাবাকে না পাবার নিদারুণ বেদনার মধ্যেও ও যেন ভরসা পেল।

খানিকক্ষণ বাদে যমুনা বলল, 'এরকম ভেঙে পড়লে চলবে? ওরা হয়তো কোথাও কাজে গেছে। চলো, পাড়ার বেড়ালদের কাছে খোঁজ নিই।'

এবারে মনে একটু জোর পেল রূপু। মোড়ের কাছে দাঁড়াতেই সে বাড়ির পাটকিলে রঙের হুলোটাকে দেখা গেল। সে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে বলল, 'কে হে তোমরা, কী চাও?'

রূপু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আজ্ঞে আমরা রূপু আর যমুনা। আপনার পরিচয়?'

পাটকিলে বলল, 'আমাকে চেন না? আমি টম। কাকে খুঁজছ?'

রূপু বলল, 'টমচাচা, ওই ১৬ নম্বর বাড়ির কোনো খবর আছে?'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে টমচাচা বলল, '১৬ নম্বর! কেন? এ খোঁজ করছ কেন?'

রূপু বোকার মতন বলে ফেলল, 'না, ও বাড়িতে আমি থাকতাম কিনা।' তার কথা শেষ হবার আগেই মাথা ঝাঁকিয়ে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে টমচাচা বলল, 'কক্ষনো না! ও বাড়িতে কোনোদিন কোনো বেড়াল ছিল না। ও বাড়িতে থাকত একটি ছোট ছেলে আর তার মা। ছেলেটির অবশ্য মনটা বেশ ভালো ছিল— বেড়ালদের উপর তার নজর ছিল। কিন্তু ওদের কাজের লোক দু'চোখে বেড়াল দেখতে পারত না। আমাকেই ঝাঁটা পেটা করার চেষ্টা করেছে কতদিন। সুতরাং ও বাড়িতে বেড়াল থাকতেই পারে না। মিথ্যা কথা না বলে তোমার মতলবটা খুলে বলো দেখি।'

রূপু বুঝল ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'ভুল হয়ে গেছে স্যার, ক্ষমা করবেন। কিন্তু ও বাড়ির লোকজন সব কোথায়?'

টমচাচা বলল, 'ক'দিন আগে ও বাড়ির ছেলেটা একটা অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেই থেকে ওর মাকেও আর দেখেছি না। কে জানে, ছেলেটা বেঁচেই আছে কী না।'

রূপুর ভীষণ ইচ্ছা করছিল যে বলে 'এই তো আমি', কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল।

টমচাচা বলল, 'তোমরা এ পাড়ায় নতুন। যদি আশ্রয় চাও তো বলি, সোজা লেক ভিউ রোডের মোড়ে গেলে দেখবে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ি আছে। সেখানে কয়েক ঘর বেড়াল থাকে। ওখানে গেলেই মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে।'

টমচাচাকে ধন্যবাদ দিয়ে এগোল রূপু আর যমুনা। দু-পা যেতেই ওদের উল্টো দিকের বাড়ির যমজ বেড়ালনির সঙ্গে দেখা। তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে জানা গেল যে তাদের নাম সীতা আর গীতা, কিন্তু নতুন কোনো খবর পাওয়া গেল না। আরেকটু এগোতেই ২৪ নম্বর বাড়ির সেই ন্যাকা বেড়াল—তার নাম নাকি ললিতলবঙ্গলতা। সে বলল, 'না ভাই, আমাকে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করো না। আমি কিচ্ছু জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে আমি এ বাড়ির বেড়াল আর আমার বাইরে যাওয়া বারণ।'

ললিতলবঙ্গলতাকে এড়িয়ে আরেকটু এগোতেই দেখা গেল ভাঙা বাড়িটা। রূপু অবশ্য বাড়িটার কথা আগেই জানত। সে ভাবত ওখানে চোর-ডাকাতের আড্ডা আর নয়তো বা ভূতের কেল্লা। এবার স্বচক্ষে দেখল ওখানে আড্ডা গেড়েছে হাফ-ডজন বেওয়ারিশ বেড়াল। রূপু আর যমুনা নিজেদের পরিচয় দিতে জানতে পারল ওদের নাম ম্যাও, মিউ, পুশি, কিটি নেবুকাডনেজার আর নেফারটিটি। সাগ্রহে সবাই মিলে ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

আর রাতের খাওয়া? অতিথিদের জন্য ম্যাও আনল একজোড়া নেংটি ইঁদুর, মিউ আনল মাছের কাঁটা, পুশি আনল একটা মুরগির হাড়, কিটি খানিকটা আধসেদ্ধ মাংস (বোধহয় কারুর হাঁড়ির থেকে চুরি করা), নেবুকাডনেজার একটা মরা ব্যাঙ আর নেফারটিটি একটা টিকটিকি। তাই ভাগ করে সকলের মহাভোজ। আর তারপরে তোফা ঘুম।

তেরো : যমুনা আবার জেনি হল

পরের দিন সকালে ওরা চাটাচাটি সেরে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে পড়ল, অবশ্যই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। সবারই সাদর আমন্ত্রণ রইল এখানে যতদিন খুশি থাকার। অবশ্য বেড়াল জগতের নিয়ম অনুসারে প্রথম দিনটার খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থা করে হোস্টরা। দ্বিতীয় দিন থেকে গেস্টদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়।

ওদের উদ্দেশ্য ছিল বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করে যদি কোনো খবর পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করা। কিন্তু ১৬ নম্বরের সামনে এসে দেখল বাড়ি সেই রকমই সপাটে বন্ধ। কোনো সাড়া শব্দই নেই। সামনের বাড়ির সীতা আর গীতাও জানাল যে পরিস্থিতি অপরিবর্তিত—কাল রাতেও কেউ আসেনি এ বাড়িতে। গত কয়েকদিনই এরকম চলছে। গেল কোথায় সবাই?

একটু বিমর্ষ মনে ঘোরাঘুরি করতে করতে রূপুর মনে হল একবার মাসির বাড়িতে খোঁজ নিলে হয়। যদি মা একা বাড়িতে না ফিরে মাসির বাড়িতে থেকে থাকেন। ওর মাসির বাড়ি কাছেই, সাদার্ন এভিনিউতে 'এভিনিউ হাউস'। মস্ত বড়ো মাল্টিস্টোরিড বাড়িতে ঢোকার সমস্যার কথাটা রূপু ভাবেইনি আগে। ঝকঝকে লিফ্‌ট, তকতকে সিঁড়ি। কিন্তু সেখানে পা রাখার উপায় নেই। নীচের তলায় গাড়ি পার্কিং-এর জায়গাতে বুড়ো দারোয়ান ছাড়াও এক গুর্খা সিকিউরিটি এজেন্সির লোক। তার হাতে মোটা লাঠি। ওদের দেখেই তেড়ে মারতে এল। তার উপর আবার জুটে গেল কোনো ফ্ল্যাটের একটা স্পিৎজ কুকুর। খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে আসে। সুতরাং ওদিকে যাওয়া অসম্ভব।

উপায়ান্তর না দেখে ফ্ল্যাট বাড়ির উল্টো দিকে রাস্তার মাঝখানে যে অংশটায় গাছ লাগানো, সেখানটায় বসল ওরা। রূপু দেখাল যমুনাকে, 'ওই সাত তলার ফ্ল্যাটটা মাসিমণিদের'। ইচ্ছা, যদি মাসিমণিদের কাউকে দেখতে পাওয়া যায়। খানিকক্ষণ বাদে মাসিমণিদের মারুতি জেনটা বেরোল। হ্যাঁ, ওইটাই—গ্রে রঙের, ডব্লু বি ০২ এম ৭৭৪৯—বাহাদুরদাদা চালাচ্ছে, পিছনে মাসিমণি আর তুতুল-মিতুল দুজনেই। মাসিমণির যমজ মেয়েদের বয়স চার। খুব মিষ্টি দেখতে দুটোই, আর রূপুদাদাকে কী ভালোই না বাসে! রূপু লাফিয়ে উঠল, 'মাসিমণি, এই যে আমি এখানে। আমি রূপু, বেড়াল হয়ে গেছি। আমাকে চিনতে পারছ না?' মাসিমণি ওর কথা শুনতে পেলেও বুঝলেন বলে মনে হল না। জানলার কাঁচ তুলে দিলেন, এসি চলতে

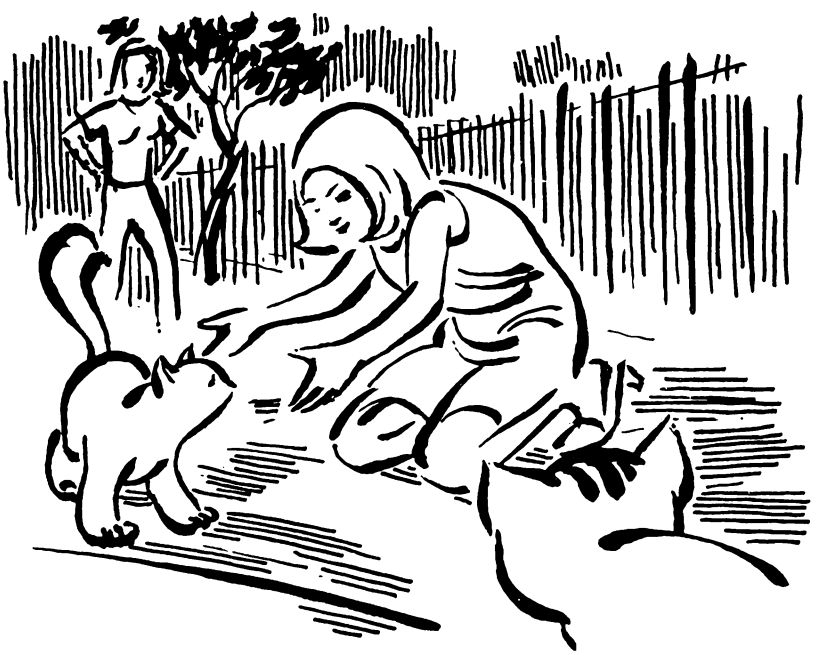

থাকল, গাড়িটা সাদার্ন এভিনিউ দিয়ে বোঁ করে চলে গেল গোলপার্কের দিকে। হতাশ হয়ে বসে পড়ল রূপু। ওকে চেটে সান্ত্বনা দিল যমুনা।

ফেরার সময়ে ওরা বিবেকানন্দ পার্কের পাশ দিয়ে ঢুকছিল। পার্কে ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প চলছে। দস্তুর মতন নেট প্র্যাকটিস করছে খুদের দল। আর একদল দৌড়চ্ছে, ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করছে, কোচের সঙ্গে আলোচনা করছে। দেখেই রূপুর মনের ভিতরটা হু হু করে উঠল।

বিবেকানন্দ পার্কের গেটের কাছটায় ফুচকা-আইসক্রিমওয়ালারা ভিড় করে থাকে। সেখানে আরও কয়েকজনের মতন ছিলেন এক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা আর বছর ষোল'র একটি মেয়ে। ভদ্রলোকের পরনে টি-শার্ট আর জিন্‌স—বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। ভদ্রমহিলা আর মেয়েটির পরনে স্কার্ট-ব্লাউজ। এদিকে স্কার্ট পরা মহিলা তো বড়ো একটা দেখা যায় না, তাই একটু কৌতূহল ভরে তাকিয়ে ছিল রূপু। খেয়ালই করেনি যে যমুনা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে ওর দু'পা পিছনে।

আইসক্রিম হাতে মেয়েটি ঘুরেই ওদের দেখতে পেল আর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ওঃ মামি! সি লুকস্ জাস্ট লাইক মাই জেনি।' যমুনা একদৃষ্টে দেখছে তাকে। এবার মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ নো, সি ইজ নান্ আদার দ্যান জেনি!' বলে দু'পা এগিয়ে হাঁটু গেড়ে ফুটপাতে বসে পড়ল আর দু'হাত বাড়িয়ে দিল যমুনার দিকে। যমুনাও ঘর ঘর শব্দ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল তার দিকে।

এই তাহলে যমুনার, থুড়ি জেনির, ইভন! ইভন দু'হাতে জেনিকে জড়িয়ে ধরল। আইসক্রিমের বাকিটা খাইয়ে দিল ওকে। হাত বোলাতে বোলাতে কোলে তুলে নিল আর বারে বারেই বলতে লাগল, 'মাই সুইট, মাই ডার্লিং!' তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যমুনাকে জড়িয়ে নিল গলায়। আর কোনও সন্দেহই রইল না।

ওর বাবা-মাও বেশ উত্তেজিত। ওঁদের কথা মন দিয়ে শুনছিল রূপু, এবার যমুনাকে ডেকে বলল, 'তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। ওরা তোমাকে ছেড়ে পালায় নি। ঠিক সেই সময় ইভন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে ওকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি। বাবা-মা ওকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। একটু সামলে উঠতেই তোমার খোঁজ করে আর পান নি। ওরা সত্যিই ভালোবাসে তোমাকে।'

সত্যিই রূপু দেখল ভদ্রমহিলার চোখে জল, বার বার বিড়বিড় করে বলছেন, 'থ্যাঙ্ক গড, জেনি হ্যাজ কাম ব্যাক'।

ওখান থেকে ওদের বাড়ি কাছেই। জেনিকে গলায় জড়িয়ে ইভন সেইদিকে পা চালাল। সঙ্গে ওর মা-বাবা। একটু পিছনে পিছনে রূপুও আসছিল। মোড়ের বাড়িটার দোতলার ফ্ল্যাটটা ওদের। দরজা খুলে ইভন আর ওর মা ঢুকে গেলেন। পায়ে পায়ে রূপুও এগোচ্ছিল, বাধা দিলেন ইভনের বাবা মিস্টার ডিসুজা, 'ওঃ নো, নট ইউ, ওল্ড চ্যাপ! নট এনাফ স্পেস ফর টু ক্যাট্‌স ইন দিস স্মল ফ্ল্যাট। বেটার ফাইন্ড ইওর ওন প্লেস।'

দরজাটা ওর মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেল। এবারে একা, একেবারে একা রূপু। ওর চোখে জল এসে গেল, এমনকি থাবা চাটতেও ভুলে গেল ও। এত দুঃখের মধ্যেও কিন্তু যমুনার কথা ভেবে আনন্দ হল—যমুনা নয়, এখন আবার জেনি ডিসুজা হয়েছে সে। ঘর ফিরে পেয়েছে, পেয়েছে নিজের মালকিনকে। আহা, ওর ভালো হোক! বড্ড ভালো মেয়ে যমুনা।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নামল রূপু। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে দেখল বাড়িটার দিকে। তক্ষুনি বারান্দায় এসে দাঁড়াল যমুনা, 'চিন্তা কোরো না, রূপু। লেক রোডের ওই ভাঙা বাড়িটায় ফিরে যাও। আমি ওখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব। ভুলো না, আমি তোমার বন্ধু আছি আর থাকব।'

এবার বিদায় নিল রূপু। আবার শুরু তার একা পথ চলা। কোথায় যাবে সে? জানে না। শুধু এইটুকু জানে যে একা ওই পোড়ো বাড়িটায় সে ফিরতে পারবে না। চলল রূপু সাদার্ন এভিনিউ-এর দিকে।

(ক্রমশ)

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

[বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

খেলোয়ার

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

ফুটবল্ 'ম্যাচ্' দেখে বাড়ী ফিরে সন্ধ্যায়—
হাবু বাবু বিছানায় ঢুলে পড়ে তন্দ্রায়;
যেই শোওয়া সেই ঘুম— সাড়া নেই আর তার,
ভোঁস্ ভোঁস্ গর্জ্জনে নাক ডাকে বার বার।
স্বপ্নের ঝোঁকে দেখে— হয়েছে সে 'কাপ্ত্যান্',—
উল্লাসে বল নিয়ে ময়দানে লাফ্ দ্যান্।
খেলা আজ জমকালো— সব সেরা একদম্,
হাবু আজ কাপ্ত্যান্,— লোকে মাঠ গম্‌গম্।
হাবু বাবু আস্‌তেই বল্ নিয়ে ময়দান—
আহ্লাদে চারিদিকে ওঠে তার জয়গান;
বাপ্‌রে সে কোলাহলে তালা লাগে কাণটায়,
মাথা ঘোরে বন্ বন্— হায় বুঝি প্রাণ যায়।
শন্ শন্ ছোটে হাবু— কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ,—
কেড়ে নিয়ে বলখানি বিপক্ষ কুপোকাৎ।
বাহিরেতে কোলাহল— "তাজ্জব খেলোয়ার,—
দুনিয়ায় এইরূপ দুটি খুঁজে মেলা ভার;"
ঘন ঘন হাততালি— সোল্লাস চীৎকার,—
হাবু ছোটে, ভ্রুক্ষেপ নাহি কোনো দিক্ তার।
এইবার এইবার এক "সুট্" মারলেই,—
নিশ্চিত গোল হবে— সন্দেহ আর নাই।
বাস্ বাস্,— হাবু বাবু তাক্ করে' গোলটায়—
প্রাণপণে শাঁই করে' সুট্ মারে বল্‌টায়।
মামা ছিল পাশে শুয়ে— অচেতন নিদ্রায়,
দ্রুম করে' লাথিখানি লাগে গিয়ে তার গায়।
আৎকিয়ে মামা তার জেগে ওঠে, তারপর—
কাণ করে হাব্‌লার, পটাপট্ থাপ্পর।

বানান অপরিবর্তিত

পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন, ১৩৩০

বাতাসের বড়াই

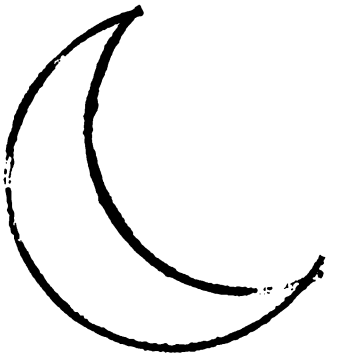

শবনম নাদিয়া

চাঁদকে ডেকে বললে বাতাস 'শোন্ শয়তান!
আঁধার রাতে
এক চোখেতে
যদি আবার
আমায় দেখিস,
হবি ভ্যানিশ।
করব সাবাড়
এইক্ষণেতেই আকাশে তোর রাখব না স্থান।'

গাল ফুলিয়ে, দারুণ জোরে যেই দিল শিস্—
হাসি মুখে
মেঘের কোলে
মনের সুখে
বাতাস দোলে।
চাঁদটা হঠাৎ উধাও হয়ে কোথায় ভ্যানিশ্!

দু'দিন বাদেই আবার দেখে—কোথায় ফাঁকা!
হলদে মুখো
ওই যে দূরে
দেখাচ্ছে মুখ
আকাশ ফুঁড়ে,
দিব্যি বেঁচে হচ্ছে সে যে কাস্তে বাঁকা—
কাস্তে থেকে এবার হবে রুপোর টাকা।

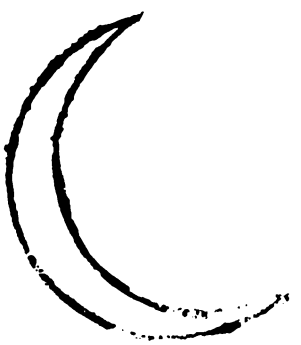

কাস্তেটা ফের হচ্ছে দেখে রুপোর থালা,
ধরল বাতাস
রূপ অতিকায়,
ভরল আকাশ
খুব ঝটিকায়;
করল যে কান ঝড়-তুফানে ঝালাপালা।
শাবল দিয়ে ভাঙবে নাকি গোল সে থালা!

'এইবারে চাঁদ এক্কেবরে পরপারে!'
আবারও সে দিল যে ফুঁ
চাঁদটা হল সুতা সরু।
একটা ফুঁয়ে কালচে হল চাঁদের সাদা,
দুইটা ফুঁয়ে চাঁদের শরীর হল আধা,
পেটের ভেতর সব হাওয়াকে করে জড়ো
বাতাস মিঁয়ার শেষ চেষ্টা মস্ত বড়ো।

শেষের বারে দিল ঢেলে গায়ের যত জোর,
ভাবটা যেন আকাশ ছিঁড়ে আনবে কেড়ে ভোর।
উধাও হল
চাঁদের আলো
আকাশ ছেয়ে
থাকল চেয়ে
নিকষ কালো।
শান্তি পেল
বাতাস এবার।
'এখন থেকে সাঁঝবেলাতে আকাশপানে যেই
মুখ ফেরাব, দেখব চেয়ে, চাঁদ পাজিটা নেই!'

ঘুমোয় বাতাস মনটা ভরে সুখ স্বপনে,
খুশির চোটে নাচে বাতাস ক্ষণে ক্ষণে।
সাগরকূলে
ঘাসে ফুলে
হেলে দুলে
ঝড়টি তুলে

মুখটা তুলে হঠাৎ দেখে আকাশ কোণে
চিকন বাঁকা চাঁদটা ঝোলে আপনমনে।

রাগের চোটে লাফায় ঝাঁপায় বাতাস বোকা
'কেমন করে চাঁদটা আমায় দিল ধোঁকা!'
উঠছে ভরে
একটু করে
হাসি চাঁদে।
'করব ধ্বংস
ভূতের বংশ।'
বাতাস কাঁদে।

চিৎকারে তার নিজের কানেই লাগল তালা
চাঁদটা তখন বেড়ে হল সোনার থালা।

জ্যোৎস্নাটাকেই ভেবে নিয়ে তিরের ফলা
বাতাস যখন চেঁচায় জোরে উঁচিয়ে গলা,
মুগ্ধ চোখে
দেখে লোকে,
ভালোবাসে—
রাত-আকাশে
তারার পাশে
চাঁদটা ভাসে
আলোয় হাসে
নিজে নিজেই। চাঁদের এবার পূর্ণ হল ষোলো কলা।

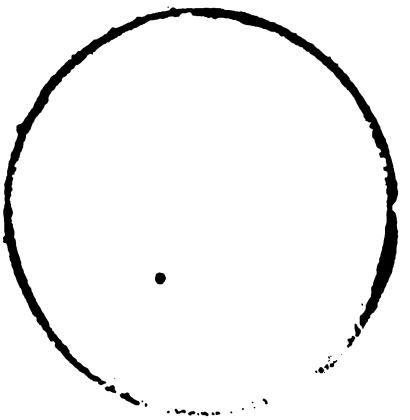

'কী ভয়ানক শক্তি আমার!' বাতাস বলে,
'বিষম জোরে
ফুঁয়ের তোড়ে
গেলেই মরে
রাতের রানি।
আরেক ফুঁয়ে
আঁধার ছুঁয়ে
জীবনখানি
দিলাম আনি,
রাতটা জুড়ে সোনার আলো উঠল জ্বলে।
আমার ভয়ে মরণ গেল দূরে চলে
আবার বেঁচে সন্ধ্যাকাশে চাঁদটা দোলে।'

বুক ফুলিয়ে বাতাস যতই করুক বড়াই দ্বারে দ্বারে
আমরা জানি চাঁদের আলো নিজে নিজেই কমে বাড়ে।
দূর গগনে
সিংহাসনে
শান্ত মনে,
দিনটা গেলে
চোখটা মেলে
রূপোর আলো
দিচ্ছে ঢেলে
মাটির কোলে
রাতের কালো ফেলছে ঠেলে।
আকাশ থেকে চাঁদটা যখন তাকায় এদিক পানে
বাতাসের ওই চিল চ্যাঁচানি পৌঁছে না তার কানে!

বিদেশি কবিতা অবলম্বনে

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

লেখার এই টাইটেল পড়েই তোমাদের ধন্দ লেগে গেল তো? না না ঘাবড়াবার কিছু নেই। লেখাটি যখন সন্দেশের জন্য আর সেই উপেন্দ্রকিশোর সুকুমার রায় মশায়দের সময় থেকেই ধাঁধা হেঁয়ালি প্রায় নিয়মিত থাকত সন্দেশের পাতায়, তাই আমিও শব্দ নিয়ে একটু খেলার চেষ্টা করেছি মাত্র, ধাঁধিয়ে দেবার মতন তেমন কিছু শক্ত কাণ্ড নয়। আমাদের ছোটবেলায় একটা শব্দ-ধাঁধার চল ছিল— সবটা মনে নেই শেষ দুটো পংক্তি হল, হরিকে দেখিয়া হরি/হরিতে লুকায়। তার মানেটা নাকি সাপকে দেখে ব্যাঙটা পদ্মবনে লুকিয়ে পড়ে। এক হরি শব্দের অর্থ ইন্দ্র বিষ্ণু সূর্য থেকে শুরু করে সাপ ব্যাঙ পর্যন্ত প্রায় ডজন খানেকের ওপর। এবার আমার এই টাইটেলটির ঢাকনা খুলি। সন্দেশ তো হল এই পত্রিকাটির নাম। সন্দেশ-এর মানে, এই মিঠে কড়া মিষ্টান্ন সে তো রসনার নিত্য-চেনা বস্তু। আবার সন্দেশের আসল অর্থ হচ্ছে সংবাদ বা বার্তা। আগেকার দিনে আত্মীয় কুটুম্বদের কাছে সুসংবাদ পাঠানো হত ডালায় সাজানো মিষ্টান্ন সহযোগে। তাই বোধ হয় খই মুড়কি বাতাসার দেশে একটু উঁচুদরের আবিষ্কার এই গব্যরসামৃত সন্দেশ। তাহলে আমার এই তাৎপাত খটমটে টাইটেলের অর্থ দাঁড়াল সন্দেশ পত্রিকায় সন্দেশ নিয়ে নানান তথ্য কথা।

সন্দেশের মতো এমন সরস সুস্বাদু বস্তুটির কথারম্ভে রসায়নের ছোঁয়া একটু লাগাতেই হয়। গরম দুধে লেবুর রস অথবা ফটকিরি মেশালে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুধ ছানায় রূপান্তরিত হয় সে তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সেই ছানার সঙ্গে পরিমাণ মতো চিনি মিশিয়ে বস্তুটি একটি বড়ো সাইজের কড়ায় দরকার মতো হাল্কা আঁচে বসিয়ে কাঠের তাড়ু দিয়ে তাড়না করে যে কত রকমের বিভিন্ন নামের বিচিত্র স্বাদের সন্দেশ তৈরি করা যায়। আর কত রকমারি নাম তাদের! যেমন কাঁচাগোল্লা, মাখা সন্দেশ, দেদো এবং কাঁচাগোল্লার একটু উন্নত এবং মোলায়েম সংস্করণ গোলাপের পাপড়ি শোভিত গোলাপি প্যাঁড়া, কস্তুরী, দেলখোস (দিলখুশ্) ইত্যাদি। এসব তো নরম পাকের, তাছাড়া কড়া পাকের মণ্ডা, রাবড়ি, তালশাঁস এবং তার মহত্তর এবং বৃহত্তর সংস্করণ জলভরা তালশাঁস যার পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া হয় চিনির রস আর শীতকালে নলেন গুড় ময়রামশাইদের কারিগরি কৌশলে। এই জলভরা তালশাঁস নিয়ে একটি ছোট্ট মজার ঘটনা মনে পড়ল।

> শিবাজি মহারাজ যুদ্ধ বিগ্রহে সদাব্যস্ত থাকায় তাঁর স্নেহময়ী জননী পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব পূরণ করতেন দধিভাণ্ড দিয়ে। তাঁর পরিবেশিত দই খাবার ফুরসৎ না পেয়ে শিবাজি মহারাজ বস্তুটি পাগড়িতে বেঁধে শিরোধার্য করতেন। কয়েক ঘণ্টা অশ্বারোহনের অবকাশে সেটি সম্পূর্ণ নির্জলা হয়ে যে বস্তুটি ক্ষুধা নিবারণ করত তারই নাম শ্রীখণ্ড।

শোনাই তোমাদের। আড়াই বছর বয়সের এক বঙ্গ শিশু তার বাবা মা আর দাদাদের সঙ্গে বঙ্গভূমি ছেড়ে রাজধানীতে প্রবাসী হয়। সেখানে স্কুল কলেজের শিক্ষা এবং তৎসহ সেখানকার সেই সময়ে সদ্য গড়ে ওঠা বাঙালি পাড়ার তৎকালীন সুদুর্লভ বাঙালি মিষ্টান্নও কখনো-সখনো চেখে থাকবে নিশ্চয়। ইতোমধ্যে কোনো এক গ্রীষ্মাবকাশে সে এসেছে দেশে বেড়াতে। চৈত্র-বৈশাখ মাস। মেলা বসেছে কল্যাণেশ্বর তলার মন্দির চত্বরে। এক ধরণের সাদাটে বিচিত্র ফল সে দেখল সাজানো রয়েছে কলাপাতায়। তার পছন্দমতো সাইজের কয়েকটি সে কিনে আনল কদলীপত্রপুটে। ফলগুলি ভরা আছে এক চুমুক রসে তার স্বাদ অনেকটা কচি ডাবের জলের মতো আর শাঁসটাও প্রায় ওই ডাবের শাঁস যেমন। নামটা জানতে চাইল। শুনল তালশাস। সে বলে উঠল 'আরে তাই মনে হচ্ছিল এর গড়নটা ঠিক ওই দিল্লির মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের জলভরা তালশাঁসের মতো। এর নামটা বুঝি ওই মিষ্টি থেকেই নেওয়া।' বোঝো ব্যাপার! নকল আসলের নামে অদলবদল। তার কথা শুনে

বিশেষভাবে পূর্বভারত, মানে বঙ্গ এবং কিছুটা উৎকল অঞ্চলের। পশ্চিম ভারত এবং উত্তর ভারতের মিষ্টি দুধ ঘন করা ক্ষীর বা খোয়ার রকমারি রূপান্তর। শুনেছি ওইসব অঞ্চলে দুধ থেকে ছানা কাটানোটা লোক সংস্কার বিরোধী মনে করা হত তাই এই নিঃসন্দেশ দেশাচার। তবে তাতে আফশোসের কিছু নেই। উত্তরভারত এবং রাজস্থানের ক্ষীরজাত মিষ্টির বৈচিত্র্যও কিছু কম নয়। প্যাঁড়া, গুঁজিয়া, বরফি কালাকাঁধ বরফি এবং বিদেশি নামধারী বিলকুল দেশি মিষ্টান্ন মিল্ক-কেক প্রভৃতি। দক্ষিণ ভারতে মিষ্টান্ন ততটা জনপ্রিয় নয় তবু কর্ণাটক অঞ্চলের একটি খুব আদরের মিষ্টির নাম টমসুর পাক, সেটিও ক্ষীরজাত। আর মহারাষ্ট্রের প্রিয় মিষ্টান্ন হচ্ছে শ্রীখণ্ড। যদিও সেটি স্বাদে গন্ধে আমাদের ভাপা সন্দেশের মতো কিন্তু তার প্রস্তুতি প্রকরণ একটু আলাদা এবং তার ইতিহাসটিও বিচিত্র কিংবদন্তি নির্ভর। বলা হয় শিবাজি মহারাজ যুদ্ধ বিগ্রহে সদাব্যস্ত থাকায় তাঁর স্নেহময়ী জননী পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব পূরণ করতেন দধিভাণ্ড দিয়ে। তাঁর পরিবেশিত দই খাবার ফুরসৎ না পেয়ে

ঘরশুদ্ধ সবার অট্টহাসির সঙ্গে তার অপ্রস্তুত মুখের ছোট্ট হাসি মেলাতে হল। সে বেচারির আর দোষ কী বল! সে এ পর্যন্ত পড়েছে তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, আর হয়তো দেখেছে ট্রেনের জানলা থেকে তালগাছের সারি। ভাদ্র মাসের পাকা তাল দূরে থাক, ভদ্র সাইজের কাঁচা তালও কখন এর আগে দেখার সুযোগ পায়নি তো! ছেলেটি আমারই কনিষ্ঠ পুত্র। বর্তমানে cosmology-র অধ্যাপক।

অম্লমধুর কৌতুকী থেকে এবার আবার মিষ্টি কথায় আসি। এই সন্দেশ বস্তুটি প্রধানত গোদুগ্ধজাত আর এটি শিবাজি মহারাজ বস্তুটি পাগড়িতে বেঁধে শিরোধার্য করতেন। কয়েক ঘণ্টা অশ্বারোহনের অবকাশে সেটি সম্পূর্ণ নির্জলা হয়ে যে বস্তুটি ক্ষুধা নিবারণ করত তারই নাম শ্রীখণ্ড। অবশ্যই কালক্রমে আধুনিক পদ্ধতি প্রকরণে সেটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

আবার সন্দেশের কথা নিয়ে দেশে ফিরে আসি। একটি কথা কবুল করতেই হয় এতোদ্দেশে একই স্বাদ গন্ধ এবং আকৃতির সন্দেশের নাম একটু দূরের পাড়ায় অন্য নামে পরিচিত। একই সন্দেশ কোথাও 'দেলখোস', কোথাও 'বাবু সন্দেশ' আবার অন্যত্র নাম 'আবার

খাবো'। এসব নাম কিন্তু কলকাতা এবং আশপাশের মফঃস্বল অঞ্চলের। এর বাইরে কিন্তু সারা বাংলা জুড়ে সন্দেশের বৈচিত্র্য বৈভব। উত্তরবঙ্গের পাবনা অঞ্চলের অপূর্ব স্বাদের এক সন্দেশ খেয়েছি (নামটা এখনই মনে পড়ছে না) কাছাকাছি গুড় লোবাতের দেশ বীরভূমে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট সন্দেশ পাওয়া যায় অনেক প্রসিদ্ধ শীর্ষস্থান আছে যখন। পাশের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কথা জানা নেই তবে বেলিয়াতোড় বা বেলেতোড়ের একধরনের উৎকৃষ্ট সন্দেশ চেখেছি নামটি (সরস নয় যদিও) ম্যাচা। আরও কাছে আছে সুমিষ্ট উদাহরণ, পাশের জেলা হুগলির জনাই এর 'মনোহরা' চেহারা এবং স্বাদে একাধারে নয়ন ও রসনা মনোহর। অতটা আভিজাত্য না থাকলেও শেওড়াফুলির মাখা সন্দেশ যেমন সুস্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যকর। ছানার অব্যবহিত পরের অবস্থা সুতরাং খাদ্যগুণ অনেকটা অবিকৃত। এই মাখা সন্দেশ সংস্কৃতির উৎসস্থল হচ্ছে কাটোয়া অঞ্চল। সেখানে তুলনামূলকভাবে অল্পমূল্য হওয়ায় সেটি 'সন্দেশায়িত' করে বিক্রির চেষ্টা চলে, সেকারণে ওই অঞ্চলের ট্রেনের কামরায় মাখা সন্দেশের ফেরিওয়ালার সুমিষ্ট উপস্থিতি দেখা যায় সঙ্গে পানীয় জলের পাত্র এবং কাচের গ্লাস নিয়ে। সে দিনের পূর্ববঙ্গ আজকের বাংলাদেশের ঢাকায় বাখরখানির যতটা নাম ডাক সন্দেশ সে তুলনায় নগণ্য। আর আমাদের সন্দেশখালিতে হয়তো খালি সন্দেশ পাওয়া যেত, এখন বোধহয় বিলকুল খালি।

সন্দেশ নিয়ে কত সব বিচিত্র কাহিনি কিংবদন্তি শোনা যায় আমাদের দেশের নানা অঞ্চলে। আমাদের ঘরের কাছেই গঙ্গার ধারে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন। মন্দির প্রতিষ্ঠায় সময়ে সেবাইতরা বিগ্রহের ভোগ নিবেদনের জন্য সন্দেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ময়রার উত্তরপুরুষরা এখনও সন্দেশ সরবরাহ করে থাকেন সেই আদিকালের মূল্যে। অতএব সেই মিষ্টান্ন এখন সন্দেশ নামে প্রায় শুভ্র শর্করাখণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সেবাইত মহল থেকে জানা যায় যে দেবতা নাকি স্বপ্নাদেশে জানিয়েছেন তিনি বিশেষ পছন্দ করছেন সন্দেশের এই আধুনিক রূপান্তর। একটু দূরে শ্রীরামপুর অঞ্চলে বল্লভপুরের মন্দিরের বিগ্রহ পছন্দ করছেন এক ধরনের মিনি সন্দেশ যা সেই অঞ্চলে গুটকা সন্দেশ বলে প্রসিদ্ধ। এরকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তবে সে সব বারান্তরে (যদি সম্ভব হয়)।

কথা শেষের আগে কিছু বনেদি মানুষের সন্দেশ প্রীতির কথা উল্লেখ করি। তার মধ্যে সর্বজনবিদিত হচ্ছে স্যার আশুতোষের সন্দেশ প্রীতি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও শোনা যায় তিনি কর্মস্থল থেকে ভবানীপুর ফেরার পথে ভীমনাগের সন্দেশের দোকান থেকে সের খানেক সন্দেশ কিনে পথে সেটি নিঃশেষ করে বাড়ি ঢুকতেন। একালে সত্যজিৎবাবুর অল্পবিস্তর সন্দেশ প্রিয়তর কথা শুনেছি। আমি অন্তত তার সাক্ষ্য দিতে রাজি। রায় মশায়ের (সমবয়সি তিনি আমার কাছে সত্যজিৎবাবু বা মানিকদা ছিলেন না) কাছে যখনই গেছি এমনকি প্রাক্ মধ্যাহ্নেও বড়ো সাইজের মোলায়েম কাঁচাগোল্লায় আপ্যায়িত হয়েছি।

শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ না করলে লেখা তো পূর্ণাঙ্গ হবে না। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ভোজন রসিক নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর সন্দেশের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব কারোর লিখিত ইতিবৃত্তে রাণী মহলানবীশ, রাণী চন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী এমনকি প্রতিমাদেবীর লেখাতেও চোখে পড়েনি। একমাত্র সাক্ষী তিনি নিজে যা তিনি কবুল করেছেন তাঁর ছেলেবেলা নিয়ে কাব্যপ্রয়াসে। সেই যে 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি/তাহাতে কদলী দলি/সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে/হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ/পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' শুনতে পাই তোমরা একালের নাতিনাতনিরা দুধ এবং দুগ্ধজাত বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে বিমুখ (অবশ্য আইসক্রিম বাদে নিশ্চয়)। তাদের কাছে এই ছড়াটি শুনিয়ে সবিনয় আবেদনসহ কথা শেষ করি। দোহাই তোমাদের আমসত্ত্ব পাও বা না পাও, অন্তত দুধে কদলী দলি তাতে সন্দেশ 'মাখিয়া' একটু চেষ্টা করে দেখো না। হাপুস-হুপুস শব্দটা না হয় নাই হোক।

ছবি : লেখক

নাটের গুরু

ফতেমোল্লা

'অ'-তে অজগর, 'আ'-তে আম, 'ই'-তে ইঁদুর, 'ঈ'-তে ঈগল...

ধূমধাম সহযোগে চলছে বাংলার ক্লাস, ইংরেজের বাসায়। যে-সে ইংরেজ নয়; একেবারে ব্রিটিশ ভারতের সমর সচিব, খোদ বড়লাটের পরেই সারা ভারতবর্ষে যার অতুল ক্ষমতা। সময়টা ভালো নয়, মোটেই ভালো নয়। ধীরে ধীরে মাথাব্যথা বেড়ে উঠছে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ আর সমর সচিবের। চারদিকে যেন কেমন কেমন ভাব। এদিকে ঠুস্ আর ওদিকে ঠাস্, এভাবে দু-একটা বোমা ফুটতে শুরু করেছে এখানে-ওখানে। ইংরেজের অধীনে আর থাকতে চায় না জাতটা। তাই ভয়, বিশেষ করে বাংলাকে নিয়ে ভয়। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী জাত এই বাঙালি, এর কিছু বিশ্বাস নেই। কখন বা কী করে ফেলে। ব্রিটিশ-কর্তাদের দূরদৃষ্টি চিরকালই ছিল। বাতাসের গন্ধ শুঁকে তাঁরা ঠিকই ধরে ফেলেছেন, ভবিষ্যতের সূর্য সেন, আলিমুদ্দিন আর ক্ষুদিরামের সময়টা খুব দূরে নয়। প্রস্তুত হতে হবে সেজন্য। বাঙালির মন জানতে হবে। তাই বাংলা ভাষা শেখাটা খুব জরুরি। কপালগুণে বাংলা শেখানোর মাস্টারটাও পেয়েছেন চমৎকার। ব্রিটিশের প্রচণ্ড ধামাধরা, প্রচণ্ড মেধাবী, এবং প্রচণ্ড বিপ্লবী-বিদ্বেষী। বিপ্লব-দমনের শলাপরামর্শটা খুব সাফল্যের সঙ্গেই তার সঙ্গে করে থাকেন সমর-সচিব।

শুরু থেকে এই জটিল পরিকল্পনা এবং তার জটিল বাস্তবায়নের কে সেই নেপথ্য-নায়ক? রিপোর্টে তার নাম দেখে আঁতকে উঠল হর্তাকর্তারা। এ যে অবিশ্বাস্য! এ যে আর কেউ নয়, এ যে সেই প্রবল বিপ্লবী-বিদ্বেষী বাংলার মাষ্টার! যার সঙ্গে বিপ্লব-দমন পরামর্শ করতেন সমর সচিব!

বুম!! কী হল, কী হল? বিরাট বিস্ফোরণের আওয়াজ! চমকে তাকাল সারা ভারত, সারা বিশ্ববাসী। হ্যাঁ, পৃথিবী-কাঁপানো ঘটনা ঘটেছে বটে। ঘুম ভেঙে গেছে সম্মানিতা কুইনের। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করে লাভ কী? ধরবি তো ধর একেবারে কালকেউটের ফণা, একেবারে বড়লাটের ওপরে। বোমা পড়েছে আর কারো নয়, একেবারে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপরে। রাগে দুঃখে উন্মাদের মতো ইন্টেলিজেন্সের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমর সচিব। খোদ বড়লাটের ওপরে বোমা, মেরেছে কোনো পালোয়ান নয়, ফুটফুটে মেয়ে লীলাবতী! তা-ও যদি মেয়েটা ধরা পড়ত। কীভাবে পালাল লীলাবতী? এতবড়ো একটা ঘটনা, নিশ্চয় বহু দিনের প্ল্যান, কেউ কিচ্ছু জানতে পারলনা কেন? ইন্টেলিজেন্স কী ঘোড়ার ঘাস কাটছে বসে বসে? প্রাণপাত করল ইন্টেলিজেন্স। দীর্ঘ দু'বছর পর তদন্ত-রিপোর্ট হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বড়লাটের দপ্তরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন স্বরাষ্ট্র-সচিব। রিপোর্ট পড়ে চোখ কপালে উঠে গেল হার্ডিঞ্জ সাহেবের। লীলাবতী আসলে মেয়েই নয়! শাড়ি পড়ে এসেছিল বাংলার বসন্ত বিশ্বাস নামে এক ফুটফুটে বালক মাত্র! কিন্তু, কে এই জটিল নাটকের নাট্যকার? শুরু থেকে এই জটিল পরিকল্পনা এবং তার জটিল বাস্তবায়নের কে সেই নেপথ্য-নায়ক? রিপোর্টে তার নাম দেখে আঁতকে উঠল কর্তারা। এ যে অবিশ্বাস্য! এ যে আর কেউ নয়, এ যে সেই প্রবল বিপ্লবী-বিদ্বেষী বাংলার মাষ্টার! যার সঙ্গে বিপ্লব-দমন পরামর্শ করতেন সমর সচিব! বন্ধুদের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা গেল সমর-সচিবের। এই তো, বোমা বিস্ফোরণের পরে সেদিনই সে ব্যাটা দেরাদুনের সভার বক্তৃতায় বিপ্লবীর ফাঁসি দাবি করে

কেঁদে কেটে সবার সামনেই রুমাল ভিজিয়ে ফেলেছিল! 'বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে ওই লোকটাই ছিল নাটের গুরু' (মাই ইন্ডিয়ান ইয়ার্স—১৯১০-১৯১৬/লর্ড হার্ডিঞ্জ)। ধর, ধর ব্যাটাকে। পুলিশ-মিলিটারি সব একসঙ্গে ছুটল তাঁর আস্তানায়।

কিন্তু হাওয়া হয়ে যাবার মন্ত্র আগে থেকেই জানা না থাকলে গুরু আর গুরু কেন। কর্পূরের মতো স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি চোখের পলকে। তারপর বিশাল ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হল লুকোচুরির বিশ্বরেকর্ড। আজ বাংলা তো কাল পঞ্জাব। কাল পঞ্জাব তো পরশু সিংহল। পরশু সিংহল তো পরের দিন আসাম। অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় চলেছে ভানুমতীর খেল। আর পেছনে ছুটছে ঘর্মাক্ত সেপাই-সান্ত্রীর দল। নাম বদলের, বেশ বদলের, রূপ বদলের, ঠিকানা বদলের ইয়ত্তা নেই। কখনো পণ্ডিতজি; কখনো শব মিছিলে আরামে শায়িত 'মৃতদেহ'; কখনো ময়লার টিন মাথায় 'হঠ যাও! হঠ যাও!' ব্যস্ত হরিজন; কখনো মালকোষ-মল্লারের আত্মহারা বেহালা-বাদক! বছরের পর বছর কেটে গেল, কানামাছি ভোঁ ভোঁ চলছেই।

কিন্তু এই বিপজ্জনক লুকোচুরির মধ্যেই পাল্টা আঘাত হানলেন সেই আশ্চর্য কর্মবীর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, অম্বাপ্রসাদ কাবুলে গড়ে তুলেছেন স্বাধীন সরকার। ব্রহ্মদেশ জার্মানি এবং তুরস্ক তাকে রাজনৈতিক স্বীকৃতিও দিয়েছিল। শত্রুকে আঘাত হানবার এই তো সময়! কাবুল থেকে পর্যন্ত তৈরি হয়ে আছে লক্ষ লক্ষ কর্তার সিং, মদনলাল ধিংড়া, ডান্ডি খান, শের খান, পিংলে। পুরো ভারত জুড়ে তখন কাজ করে চলেছেন গুরু। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫, শতধা বিস্ফোরিত হবে স্বাধীনতার আগ্নেয়গিরি। ভিসুভিয়াসের মুখে বাঁশপাতার মতো উড়ে যাবে শ্বেতাঙ্গ -পুংগবের দল। হল না। কিছু বিশ্বাসঘাতক মানুষ এখনও আছে, তখনও ছিল। তাদের দেওয়া গোপন খবরে আগেই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামরিক বাহিনী, ঠিক যেন এখনকার বাংলাদেশে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ। দাউ দাউ জ্বলে গেল হাজার হাজার নিশ্চিন্দিপুর। ধরা পড়ল, মারা পড়ল প্রায় সবাই। গুরু তখন রাজবেশ পড়ে একেবারে গিয়ে হাজির জাপানি দূতাবাসে কলকাতায়। কী ব্যাপার? না, আমি রাজা পি এন ঠাকুর, নোবেল লরিয়েট স্যার ট্যাগোর-এর আত্মীয়। জাপ-সম্রাটের আমন্ত্রণে কবি জাপান যাচ্ছেন তো, আমি আগে যাচ্ছি আয়োজন তদারক করতে অগ্রদূত হিসেবে। ভিসা চাই। সন্দেহের কোনো কারণই নেই। ততদিনে সবাই জানে জাপান-সম্রাটের আমন্ত্রণে কবিগুরু জাপান যাচ্ছেন। ভিসা এবং হারুকিমারু জাহাজে জায়গা, দুটোই মিলল। তারপর, ২২ জুন, (১৯১৭, মতান্তরে ১৯১৮) জাহাজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলেন দেশের মাটি। এই সেই দেশ। যার জন্য বাজি রেখেছিলেন প্রাণ। ছেড়ে কথা বলেননি খোদ বড়লাটকেও। আর কি এখানে ফেরা হবে কখনো?

জাপান পৌঁছবার খবরটা চটাস করে পড়ল ব্রিটিশ-সিংহের গালে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আহত অপমানিত সিংহের গর্জন। সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল জাপান সরকারকে, আমাদের বিদ্রোহী ফিরিয়ে দাও এখুনি, এই মুহূর্তে। ব্রিটিশ তখন বিজয়ী হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, লীগ অফ নেশনস্ তার হাতের মুঠোয়। তাকে 'না' বলা জাপান সরকারের পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু ওদিকে সংসদের বাইরে সমস্ত জনতা আর সংবাদ পত্রিকাগুলো তুলে ফেলেছে প্রতিবাদের ঝড়। আশ্রিত দেশপ্রেমিককে খুনির হাতে তুলে দেবার কলঙ্ক তারা কিছুতেই জাপানের গায়ে লাগতে দেবে না। কিন্তু তবু, দিনে দিনে নুয়ে এল সরকারের মেরুদণ্ড। বিদ্রোহীকে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব সরকারিভাবে পাশ হয়ে গেল জাপানের সংসদে। দিনক্ষণও ধার্য হয়ে গেল। পাশবিক উৎসাহে ফাঁসির দড়ি পাকাতে শুরু করল ব্রিটিশ। না, আর কোনো উপায় নেই। 'কোনো উপায়ই নেই আর।' বন্ধু সোমা'র দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সংসদের বিরোধী দলের নেতা তোয়ামা। বললেন, 'হল না। লোকটাকে আর বুঝি বাঁচানো গেল না হায়নার হাত থেকে।'

সোমা'র চোখে তখন ভবিষ্যৎ খেলা করছে। বললেন, 'আছে, উপায় আছে। মাত্র একটা উপায় আছে।' বাসায় এসে সোমা বললেন স্ত্রীকে, 'শুধুমাত্র একটা উপায়ই বাকি আছে।'

স্ত্রী তাকালেন কন্যা তোশিকো'র দিকে, 'মাত্র একটা উপায় আছে, মা।' নতস্বরে বললেন তোশিকো, 'আমি জানি। আমি— আমি রাজি আছি।'

ব্যস্! দূর দ্বীপবাসিনীর ছোট্ট এক মধুর সম্মতির সঙ্গে সঙ্গে মোড় ঘুরে গেল ইতিহাসের। মহাকালের ডাক এসেছে ওই, মাভৈ, মাভৈ! ভবিষ্যতের হিজ একসেলেনসি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্য, মেজর আবিদ হাসান, মেজর শাহনওয়াজ, মেজর ধীলন, কম্যান্ডার ইন চিফ মোহন সিংয়ের জন্য। গর্বিত আজাদ হিন্দু ফৌজের পদভারে কম্পিত হবার জন্য তৈরি হয়ে গেল বার্মা ইম্ফল কোহিমা সিঙ্গাপুর (থাইল্যান্ড) শ্যামদেশ নির্ধারিত হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু-নিয়তি। এদিকে বিয়ের উৎসবে মেতে উঠল সমস্ত জাপান। সেখানে

ধর্মের বই থেকে কোন কী মন্ত্র উচ্চারিত হল, তা নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। মানবতার বিয়ে হয়ে গেল স্বাধীনতার সঙ্গে। সমস্ত জাপান এক হয়ে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরল তর্জনি, 'এ এখন আমাদের জামাই! দেখি, কে গায়ে হাত দেয়!'

সংবিধানের সামনে লেজ গুটিয়ে নিল জাপান সরকার। উদ্যত কালফণা গুটিয়ে, ক্রোধে ক্ষোভে হাত কামড়াতে লাগল ব্রিটেন।

জাপানের জামাই হয়ে কাটালেও মনে ধিকিধিকি করে নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতার স্বপ্ন। আজ পেরিয়ে গেছে মাঝ বয়স, তবু উঠে দাঁড়ালেন।

চমকে ফিরে তাকাল ব্রহ্মদেশ সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া হংকং কোরিয়া ফিলিপিনের লক্ষ লক্ষ ভারতীয়। কে! ধ্বনিত হচ্ছে কার উদাত্ত আহ্বান, এসো ভাই, আর একবার চেষ্টা করে দেখি। প্রথম বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে দু-দুটো সিপাহি বিপ্লবও। কিন্তু সাফল্যের ভিত্তি গড়ে গেছে তারা নিজেদের রক্ত-হাড়-মাংস দিয়ে। চলো ভাই, আর একবার চেষ্টা করি।

এক থেকে দুই, দুই থেকে চার। বন্যার মতো এগিয়ে এল মানুষ, জাপান থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ। ত্যাগের পর ত্যাগ, সারা দূরপ্রাচ্য নিয়ে গঠিত হয়ে গেল ইন্ডিপেন্ডেনস লীগ। কেন্দ্র তার টোকিও, গুরু তার কর্ণধার। বিরাট সেনাবাহিনী গুছিয়ে তুলছেন মোহন সিং। সঙ্গে আছেন শাহনওয়াজ, ধীলন। ওদিকে সুদূর বার্লিনে মেজর আবিদ হাসানকে নিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নে গঠিত হয়ে গেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ, ভেসে আসছে মহাকালের বরাভয়, 'আমি সুভাষ বলছি। মনে রেখো, পরাধীনতার চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর নেই...' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল মৃত্যু-তরঙ্গের দুই প্রান্তে দুই বাঙালি কর্ণধার নিজেদের ছোট্ট মন পবনের নাও দুটোকে কিনারায় ভেড়াবার জন্য ব্যাকুল। ওদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজ। এদিকে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ। পৃথিবীর দুধারে দুটো মত্ত আবেগ পরস্পরকে আলিঙ্গন করার তাগিদে যেন ফুলে ফুলে উঠছে। গল্প নয়, কল্পনা নয়। তোমার আমার ইতিহাস, বিদেশের মাটিতে। এদিকে জাপানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল তোজো প্রথম থেকেই বলেছেন, 'এশিয়া ফর এশিয়ানস্। গো হোম হোয়াইটস।' তাঁর কাছে দাবি গেল, 'আমার বয়স হয়েছে। সুভাষকে এনে দাও।' ওদিকে হিটলারের কাছেও সুভাষের দাবি গেল, 'আমাকে জাপান পাঠাও। কারণ ওদিক থেকে ভারত আক্রমণ করাটাই বেশি সুবিধাজনক। তা ছাড়া ওখানে গুরু আছেন। তাঁর অধীনে সেপাই হলে গর্ববোধ করবে নেতাজি নামের সুভাষ বোস।' শয়তান এমনিতেই ঘুমায় কম, ততদিনে রাশিয়া আক্রমণ করে হিটলারের ঘুম আরও কমেছে। তবু, হিজ একসলেনসি চন্দ্র বোসের অনুরোধের একটা দাম আছে। জোগাড় হল সাবমেরিন, আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে তিন মাসের সাবমেরিনে সুভাষ এসে পৌঁছলেন জাপান। স্বাধীনতা চাই, জন্মগত অধিকার চাই। একজন প্রবীণ, অন্যজন নবীন। নবীনের হাতে সমস্ত রাজনৈতিক সামরিক দায়িত্ব তুলে দিয়ে তৃপ্তির ছুটি নিলেন অর্ধশতাব্দীর কর্মচঞ্চল মহাবিদ্রোহী নাটের গুরু। তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজলেন। সাবরমতিতে বসে বজ্রাহত বনস্পতির মতো সে খবর শুনলেন বাপুজি। শ্রদ্ধাবনত জাপানসম্রাট পাঠিয়ে দিলেন রাজশকট, সে পবিত্র মরদেহ বইবার জন্য। রাজপরিবারের বাইরে ওই একবারই কারো মৃতদেহ বইল সেটা।

নবীনের হাতে সমস্ত রাজনৈতিক সামরিক দায়িত্ব তুলে দিয়ে তৃপ্তির ছুটি নিলেন অর্ধশতাব্দীর কর্মচঞ্চল মহাবিদ্রোহী নাটের গুরু। তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজলেন। শ্রদ্ধাবনত জাপানসম্রাট পাঠিয়ে দিলেন রাজশকট, সে পবিত্র মরদেহ বইবার জন্য। রাজপরিবারের বাইরে ওই একবারই কারো মৃতদেহ বইল সেটা।

এদিকে ইউরোপে বানানো আজাদ হিন্দ ফৌজ বাতিল করা হয়েছে আগেই। সেই একই আজাদ হিন্দ ফৌজ নাম নিয়ে স্বাধীনতার দিকে পা বাড়াল ইন্ডিপেন্ডেনস লীগ। তাঁর আরেক নাম স্বাধীনতা। তাঁর আরেক নাম দেশপ্রেম। জাতি-ধর্মের বিভেদের বহু উর্ধে বিশাল মহাপুরুষ— নাম রাসবিহারী বসু।

বন্ধু

দেবাশীষ ঘোষ

হিসাব মতো রাজধানী শহর এ অঞ্চল থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে। ফিগো সাতজন্মে শহর দেখেনি। ছোট্টবেলায় একবার বাবার হাত ধরে ঘুরতে গিয়েছিল শ দেড়েক কিলোমিটার দূরের এক আধা শহরতলিতে। সেজন্যই সবাই যখন ওকে গেঁয়ো ভূত বলে রাগায় তখন সেই সমস্ত উপেক্ষা ও অম্লানবদনে সহ্য করে যায়।

বছর কুড়ি আগে সেই ছোট্টবেলাকার দিনগুলোতে কিন্তু এরকম একাকিত্ব ছিল না। স্যামুয়েল, জো, টম, ট্রেভর আর ওদের জনা বারো-চোদ্দ বন্ধু যখন একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটত তখন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়ির বউ-ঝিরা নজর করত আর ভাবত গ্রামে ডাকাত পড়ল বুঝি। সূর্য উঠতে না উঠতেই ওরা দলবল মিলে বেড়িয়ে পড়ত ইস্কুলে। কাঁধে ভারী ভারী বইয়ের বোঝা নিয়ে ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে যেত চুলবুলে ছোট্ট নদীটার মাথার উপরের কাঠের সাঁকোটা। স্কুল থেকে বাড়ি না ফিরে কতদিনই না ঝাঁপিয়ে পড়ত ছোট্ট নদীটার মিষ্টি জলে। অবশ্যি শীতের দিনগুলোর কথা আলাদা। তখন এই বইখাতা কাঁধে ইস্কুলে যাওয়াটাই দায় হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু এইভাবে তো চিরকাল চলে না। আস্তে আস্তে বড়ো হতে হল। বুঝতে হল সংসারে খাওয়া পরার সমস্যার কথা। স্যামুয়েল আর জনাচারেক বন্ধু হাত পাকালো ছুতোর মিস্ত্রির কাজে। শহরে সেই যে ওরা কাজ খুঁজতে গেল তারপর আর এই গ্রামের চৌহদ্দিতে ফিরে এল না। বাকিরা কেউ হল কল মিস্ত্রি কেউ বা হোটেলের বয়।

রিচার্ডস্‌টাও শেষমেশ একদিন পাড়ি জমাল শহরের পথে। পরে খবর এসেছিল ও নাকি শহরের খারাপ লোকেদের পাল্লায় গড়ে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে। গ্রামে এখন ওর প্রাণের বন্ধু বলতে কেবলই সুলেমান। তাও প্রাণের বন্ধুই বা কী করে বলা যায়। এক নম্বর বদমাইস আর ফাঁকিবাজ ওটা। বাপের জমিতে চাষ করে আর কারণে অকারণে দিনরাত্তির লোকজনের পিছনে লেগে বেড়ায়। ফিগোরও হাড়মাস জ্বালিয়ে খায়। ফিগো জানে ওর ছ্যাঁচড়ামিতে বেশি জ্বললে ও অনেক

বেশি পাত্তা পেয়ে যাবে। তাই নীরবেই ওর অত্যাচারগুলো হজম করে নেয়।

আর চাষ আবাদ? সময় নিয়ে মন দিয়ে করবার জো কোথায় ওর। ঘোড়াগুলোকে ঠিকঠাক খেতেই দেয় না। ওর হাড় জিরজিরে ঘোড়াগুলোকে দেখলে ভারী দুঃখ হয়। ফিগোর বাপের রেখে যাওয়া জমিগুলোর মর্যাদাই বুঝল না ও, কী নরম জমির মালিক না সুলেমান। যার বেশিরভাগটাই জঙ্গলে ঢাকা। যেটুকু জমি চাষ করে তাতে কী সুন্দর ফসলটাই না ফলে। তবুও তো সুলেমান চাষবাসের নিয়মকানুন কিছুই জানে না, ফিগোর হাতে যদি ওই জমি থাকত তাহলে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিত কী ব্যাপক ফসলই না ওতে ফলানো সম্ভব।

ফিগোর বাপ ছিল ভারী গরীব। তাই মরে যাবার আগে ছেলের জন্য চাষের উপযোগী কোনো জমিরই ব্যবস্থা করে যাননি। থাকার মধ্যে আছে এই ছোট্ট কুঁড়েটা, যেখানে বুড়ি মাকে নিয়ে ফিগো থাকে। আর এই ছোট্ট জমিটা। তাও যদি সুলেমানের মত মিহি মাটির জমি হত। জমির বেশির ভাগটাই পাথরে ভর্তি। বছর চারেক আগে বড়ো বড়ো পাথরের চাঙড় দিয়ে সমস্ত জমিটাকে ঘিরেছিল ও, তারপর নদীর পাড় থেকে বেশ কিছু টাকায় মাটি কিনে বিছিয়ে দিয়েছিল জমির উপর। মাটি কেনবার টাকাটা বার করতে হয়েছিল পলকাকার কাছ থেকে। সে বছর ফলন হয়েছিল দেদার। ধার নেওয়া টাকার অনেকটাই শোধ হয়ে গেছে।

ফিগোর আশা এ-বছরের ফলন মোটামুটি হলেই, পুরো ধারটাই শোধ হয়ে যাবে। সেই আশাতেই এ বছরের চাষের শুরুটা ফিগো সময়ের কিছু আগেই করে দিয়েছে। কাল সারাদিন ঘোড়া দুটোর সঙ্গে লাঙল পুঁতে জমি কর্ষণ করেছে। আজকের বিকেলে জমি চষাটা মোটামুটি শেষ হবে। আজ ভোর পাঁচটা থেকেই ফিগো কাজে লেগেছিল। এখন সূর্য মাথার ঠিক ওপরে ওঠবার অপেক্ষায়। ফিগো ঘোড়াদুটোকে পাইন গাছের ধারে বেঁধে গাছের ছায়ায় নরম ঘাসের ওপর বসে।

মাথার থেকে সাধের টুপিটা খুলে পাশে রাখে। এই টুপিটা ওর দীর্ঘদিনের সঙ্গী। রংটা অনেক ফিকে হয়ে গেছে, দু-এক জায়গায় চিড়ও খেয়েছে। তবুও এটা ওর পয়মন্ত টুপি। এর জোরেই না আকালের বছরেও ওর জমিতে কিছু ফলন হয়েছিল। না হলে তো সে বছর না খেয়েই মরতে হতো ওদের মা-ছেলে দুজনকে, সুলেমান এই টুপিটা নিয়েও কম রাগায় ওকে! কতবারই না ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলে। টুপি নিয়ে কথাবার্তা বললে মাঝেমধ্যেই ফিগোর রাগও হয়। কিন্তু প্রকাশ করে না

কোনদিনও। আরও ঘণ্টা দুয়েক কাজ করলে তবে জমিটা পুরোপুরি চষা হবে। ফিগো ঘোড়াগুলোর দড়িদড়া খুলে আবার লাঙলের সঙ্গে জোড়ে। আজকের সূর্যের তেজ কালকের থেকে অনেক বেশি। সকাল থেকে কাজ করে ফিগোর জামা-কাপড় ঘামে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে আছে। ঘণ্টা দুয়েক পরে ওই নদীর জলে আছড়ে পিছড়ে চান করলে তবে গায়ের জ্বলুনি মিটবে। মনে শান্তি আসবে এত খাটা-খাটুনির পরে। ঘোড়াদুটোর সঙ্গে লাঙল জুড়ে তার উপর উঠে পড়ে ফিগো। এতক্ষণে ঘোড়াগুলোকে ভালো করে দেখতে ইচ্ছা হয় ওর। ঘোড়াগুলোর জামাকাপড় নেই। তাই ঘামে ভিজে যাবারও কোন উপায় নেই। তাছাড়া মানুষের মতন ঘোড়াদের গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘামও ঝরে না।

তবুও ঘোড়াদুটোকে ভারী ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মনে হয় ওর। মনে হয় খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা এগিয়ে চলেছে লাঙলের ভার বইতে বইতে। ওদের পাগুলোও মাঝেমধ্যে টলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে ঘোড়াগুলোর উপর ভারী মায়া আর নিজের ওপর বেশ কিছু রাগও হল ফিগোর। এই দেখাটা যদি কিছুক্ষণ আগে হত তাহলে ঘোড়াদুটোকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়া যেত। পাইন গাছের ছায়ায় ঘোড়াদুটোকে ভালো করে বাঁধল ফিগো। ভাবল ঘোড়াদুটোর কেমন কষ্ট হয় আজ তা নিজেই পরখ করবে। মাথার ওপর সূর্য। ফিগো নিজের কাঁধেই লাঙল নিয়ে চষতে থাকে জমি।

গরমে ভারী কষ্ট হয়। কাঁধের ওপর লাঙলের ভার অসম্ভব কষ্ট হয় শরীরে। তা সত্ত্বেও লাঙল নিয়ে এগিয়ে চলে ফিগো। ঠিক একই সময়েই হাজির হয় সুলেমান। মনে হয় এই মোক্ষম সময়ের অপেক্ষাতেই ও ওঁত পেতে ছিল। নানারকম টিট্‌কিরি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলেমান এও বলল যে ওর এই অবস্থা দেখে ঘোড়াগুলো পাইন গাছের আড়াল থেকে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। ফিগো নিরুত্তর থাকায় শেষ পর্যন্ত সুলেমান রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজের জমির দিকে চলল।

জমি চষার শেষে ফিগো ঘোড়াগুলোর পাশে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে। একটু বাদেই বুড়ি মা দুপুরের খাবার নিয়ে আসবেন। তার আগে নদীতে গিয়ে শরীরটাকে ভালো করে জুড়োতে হবে। ঘোড়াগুলো যাতে আরও ভালভাবে ঘাস পেতে পারে সেজন্য দড়ি আলগা করে ফিগো ঘাসজমির ওপর টানটান হয়ে শোয়। একটু তন্দ্রা এসেছিল। ভিজে একটা অনুভব গালের পাশে পেয়ে চোখ খুলে দেখে একটা ঘোড়া আদর করে ওর গাল চাটছে আর অন্যটা পিছন থেকে তা লক্ষ্য করছে।

ফিগোর ভারী ভালো লাগল, ও বেশ বুঝল এই গোটা পৃথিবীর জ্যান্ত মানুষগুলোর থেকে এই অবোধ পশুগুলোর ওর প্রতি অব্যক্ত ভালোবাসা কোনও অংশেই খাটো নয়। ওরা টাকা পয়সা, জামা কাপড়, গয়না-গাটি কিছুই বোঝে না। কেবল চায় একটু অনুভব, একটু-আন্তরিকতা। আনন্দে ফিগোর চোখে জল এসে গেল। ভেজা চোখে ও স্পষ্টই দেখল ঘোড়াগুলো হাসছে। সে হাসি অনেক মিষ্টি অনেক প্রশান্তির, সুলেমান হাজার নজর করলেও সেই হদিশ পাবে না।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

অঙ্কের মজা!

স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী

টুসির পেনসিলের অঙ্কটা মোটেই সহজ ছিল না। অবশ্য, মাথা তো একটু ঘামাতেই হবে। মাথা না ঘামিয়ে যে মজা পাওয়া যায়, তার মধ্যে আর যাই হোক, মনমাতানো আনন্দ পাওয়া যায় না।

টুসিকে বললাম, 'গুরুমারা বিদ্যে তো ভালোই হয়েছে রে। দারুণ। আমার অঙ্কের মজা সার্থক।'

টুসি বলল, 'রমলাবৌদির যে ধাঁধাটা দিয়েছিলে, বলনি কিন্তু, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমবয়েসি কেউ আছে কিনা?'

আমি বললাম, 'ইয়ার্কি? সমবয়েসি থাকতে পারে? বুঝেছি, অলরেডি সল্‌ভ্‌ড, তাই না?'

টুসি মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করার ভঙ্গীতে বলল, 'ইয়েস স্যার।'

বিষয়টা বানিয়েছিলাম এইরকম —

রমলাবৌদির চার ছেলেমেয়ে, অমল, বিমলা, কমল আর ইরাবতী। বিমলার বয়স ইরাবতীর বয়েসের দ্বিগুণ। দু'বছর আগে অমলের বয়স কমলের বয়সের দ্বিগুণ ছিল। চারবছর আগে বিমলার বয়স কমলের বয়েসের দ্বিগুণ ছিল। দু'বছর পর অমলের বয়স ইরাবতীর বয়সের দ্বিগুণ হবে। তিন বছর আগে কমলের বয়স ইরাবতীর বয়সের দ্বিগুণ ছিল। ছেলেমেয়েদের বয়সের যোগফল রমলাবৌদির এখনকার বয়সের সমান।

টুসির মতো তোমরাও নিশ্চয়ই এখন অঙ্কের মজা উপভোগ করতে শুরু করেছ। ও পেরেছে, আর তোমরা পারবে না?

গত সংখ্যার উত্তর

চারটে পেনসিলের দাম : ১ টাকা, ১ টাকা ৫০ পয়সা, ২ টাকা আর ২ টাকা ২৫ পয়সা। এদের যোগফল = ১.০০ + ১.৫০ + ২.০০ + ২.২৫ = ৬ টাকা ৭৫ পয়সা। এদের গুণফল = ১.০০ × ১.৫০ × ২.০০ × ২.২৫ = ৬ টাকা ৭৫ পয়সা।

শব্দ-সন্ধান

বর্ণবণিক

নীচে মোট ছ'টি সংকেত দেওয়া হল। এর প্রথম পাঁচটি সংকেত থেকে তৈরি হবে একটা করে পাঁচ বর্ণওয়ালা শব্দ। এবার প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণগুলিকে নীচের পাঁচটি গোলঘরে বসিয়ে দাও, ওইগুলোকে উল্টোপাল্টে দিলেই পাবে ষষ্ঠ সংকেতের উত্তর।

কোনার্ক আর তাজমহল কীসের জন্য বিখ্যাত

গঙ্গা-যমুনা এমন কিন্তু সরস্বতী এমন নয়

মুসলমান আমলে রাজস্ব ব্যাপারে হিসাবরক্ষক

এর মানে কেনাকাটাও হয় কেনাকাটার জায়গাও হয়

মানুষকে দেখতে সুন্দর করে বলে নাপিতের প্রতিশব্দ

পাণ্ডবদের মৃত্যুকে মহাভারতে যা বলা হয়েছে

গত সংখ্যার শব্দশরীর-এর উত্তর

● নাক সিঁটকোনো ● নাক উঁচু ● নাক কান মলা ● নাক কাটা ● নাকে মুখে গোঁজা।

নন্দ গুপীর নন্দ কপাল

দিলীপ দাস

জেঠু-মা-পিসি- তোমরা শিগগির এসো!
আরে, তোর কী হলো? কেন অমন পাগলের মতো করছিস?
সর্বনাশ! নন্দ-গুপী গাছে চড়ে কী করছে?
অ্যাই-অ্যাই নন্দ, ছেড়ে দে! ওকে এভাবে টানাটানি করছিস কেন? পড়ে মরবি নাকি?
আগে ওকে গাছ থেকে নামতে বল।
বলতে না বলতেই —
দড়াম,
বাপস!
উফ!
মাগো!
গর্দভ! তোদের ফাঁদে পরে আর একটু হলেই আমি চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছিলাম!
ও-ওই গুপীর জন্যই এমনটা হল!
আমি তোর কী করেছি? তুই-ই তো আমাকে-
দেখনা পিসি, আমি দড়ি নিয়ে গাছে উঠছিলাম একটা দোলনা খাটাবো বলে। নন্দ কোত্থেকে এসে—তুমি তো সব দেখলে!
সত্যি তো, কেন তুই ওকে খামোখা ওভাবে টানছিলি?
তুমি ঠিক সময়ে না এলে পিসি—!
আ-আমার ভুল হয়েছে পিসি! গু-গুপীকে দড়ি নিয়ে গাছে উঠতে দেখে ভাবলাম, ও হয়তো গলায় দড়ি দিতে—
বোকার মরণ আর কাকে বলে! যাঃ, এবার দু'জনে মিলে কাজটা করে ফেল।

বিদেশীয় দিশি

পাঁচ কথার পাঁচ

শুভেন্দু দাশমুন্সী

আজ কথা পাড়তে হল লাবণ্যকে। রীতিমতো গলদঘর্ম হয়ে ঘরে ঢুকে দু'গ্লাস জল খেয়ে একটু ঠান্ডা হতেই বুলবুল তাঁকে জিগ্যেস করে উঠল, 'গতদিনের আড্ডায় আমি লোডশেডিংকে লোডশেডিং বলায় কী ভুল হয়েছিল, দিদি?'

লাবণ্য ঠান্ডা গলায় বললেন, 'না কিছু ভুল হয়নি তো!'

'তাহলে যে আপনি বললেন আমার কথার খেই ধরেই নাকি আজকের আড্ডা শুরু হবে।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য বলেছিলাম বটে।'

'না বুলবুলদা শুধু তোমার কথায় নয়, দিদি আমার কথার সূত্র ধরেও আজ কথা শুরু করবেন বলেছিলেন। মনে আছে তো?' প্রশ্নটা করল রিমঝিম।

'আর কার মনে আছে জানি না', লাবণ্য বললেন, 'তবে আমার বেশ ভালোই মনে আছে। ওই যে রিনি বলেছিলি ওই লোডশেডিংটা নাকি আমাদের আড্ডায় জল ঢেলে দিল। তবে আমাদের মধ্যে একজন বেশ দুষ্টু লোক বসে আছে, তাকে তোমরা দেখোই না।'

'কে তিনি?' যথারীতি হাঁ হাঁ করে উঠল কালাচাঁদ।

আমার দিকে ঘুরে লাবণ্য বলল, 'কী ব্যাপার মুনশিজি আপনি বেশ চুপচাপ থেকে লেখায় এমন মজা করেন অথচ আমাদের কিচ্ছুটি বলেন না পর্যন্ত।'

আমি অপরাধীর অপরাধ ধরা পড়ে যাওয়ার মতো যথারীতি নিঃশব্দ। শুধু বললাম, 'আমার দোষটা কোথায় হল যদি বলেন, বা আমি কোথায় কি হিমালয়ান ব্লান্ডার করলাম যে ধরিয়ে দেবেন।'

'ওফ আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না। আবার দুষ্টুমি!' আমাকে মৃদু বকলেন লাবণ্য!

সকলে অথই জলে! কিছুই বোঝা যাচ্ছে না— পাঁচ কথার মাঝখানে এই দ্বিরালাপ বন্ধ করার কথা ভেবে কালাচাঁদ বলে উঠল, 'প্লিজ দিদি এই দুষ্টুমির ওপর দুষ্টুমির ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন।'

'সে কথা পরে বলব আগে বলব, ভোকাবুলারি সভায়—'

'কিংবা বলুন এই ভো.কা.বু.লা.রি-দের সভায়' ফোড়ন কাটে কালাচাঁদ।

সকলে হেসে ওঠে। লাবণ্য বলেন, 'হ্যাঁ এই ভো.কা.বু.লা.রি-দের সভায় গতদিন কথার মাঝখানে জল ঢেলে দিয়েছিল লোডশেডিং। সেখান থেকেই শুরু করা যাক। আচ্ছা, লোডশেডিং শব্দটা অভিধানে দেখেছ কোনোদিন। মানে অক্সফোর্ড, চেম্বারস কোনও অভিধানে দেখেছ কি শব্দটা!'

'না দেখিনি তবে দেখলেই হত।' কালাচাঁদের ঝটিতি জবাব।

'তাহলে দেখো তো পাও কিনা।'

কালাচাঁদ তাক থেকে বিদেশি অভিধানগুলো নামিয়ে আনল—খুলল এল-ওয়ালা শব্দরাজি। কিন্তু অনেক খুঁজেও পেল না শব্দটা।

'কী হল ব্যাপারটা!' কালাচাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে আবার খুঁজতে বসল— তার সঙ্গে চেম্বারের অভিধান খুঁজতে বসল রিমঝিম আর অক্সফোর্ডের রেফারেন্স ডিক্সনারি খুলে বসল বুলবুল। আঁতিপাঁতি করে শব্দটা খুঁজে চলল তিনজন। কিন্তু নাহ্— কোথাও নেই!

কালাচাঁদ বলল, 'দেখেছ কী ভালো আছে সাহেবরা ওদের দেশে লোডশেডিং হয় না। লোডশেডিং শুধু আমাদেরই হয়!'

ভোলানাথবাবু বললেন, 'তোমার কথাটা, বুঝলে কালাচাঁদ, এক অর্থে ঠিক।'

লাবণ্য বললেন, 'লোডশেডিং ওদের ওখানে হয় না কারণ লোডশেডিংটা আমাদের বানানো শব্দ। কিন্তু লোডশেডিং-এর কষ্ট ওদেরও পোহাতে হয় কারণ পাওয়ার কাট ওদেরও হয়। অভিধানে দেখো পাওয়ার কাট শব্দটা পাবে, কিন্তু লোডশেডিং নেই।'

'বলেন কী লোডশেডিং আমাদের বানানো শব্দ!' রিমঝিম কালাচাঁদ একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে ওঠে।

বুলবুল বলে, 'আমি একবার একটা কবিতায় লিখেছিলাম : ''পাড়ায় ঘনাল ছায়া নিদাঘ সঘন''। অনেকে আমাকে বলেছিল লোডশেডিং-এর চমৎকার বাংলা বানিয়েছে তো 'ছায়াঘনানো'—এখন দেখছি একেবারে বোকা বনে গেছি।'

'না না তুমি বোকা বনবে কেন। তোমার বাংলাটা

সত্যিই বেশ হয়েছে। তবে তুমি জানো নিশ্চয়ই এখানে শেডিং বানানে দুটোই— অর্থাৎ Sheeding, Shade নয়। পরে দেখো দুটো ই-ওয়ালা শেডিং-এর একটা অর্থ সাধারণত বিদ্যুৎ ছাঁটাই—'

'বুলবুলদার কথায় হঠাৎ একথা বলছেন কেন?' জিজ্ঞাসা করল কালাচাঁদ।

'আসলে ওর কবিতার লাইনে ছায়া শব্দটা শুনে মনে হল ও হয়ত শেড মানে ছায়া ভেবেছে।'

'কী বুলবুলদা, ওরকম কিছু ভেবেছিলে না কি?' কালাচাঁদের কথা ফুরোনোর আগেই দেখা গেল জিভ কাটছে বুলবুল।

'না না তাতে কিছু নয়, 'সস্নেহে লাবণ্য বললেন, আর তাছাড়া লোডশেডিংটা শব্দটা আমাদের তৈরি বলেই তো আর শব্দটা বাংলা নয়। যেমন ধরো বায়োডেটা! এটাও তো ইংরাজি শব্দ—কিন্তু এটাও তো আমাদের তৈরি ইংরাজি শব্দ।' লাবণ্য বললেন, 'খুঁজে দেখো'খন বায়োডেটা শব্দটাও বিদেশি অভিধানে পাবে না।'

'কিন্তু তাই বলে কি আমরা বায়োডেটার বাংলা জীবনপঞ্জি করিনি?'

ভোলানাথবাবু বললেন, 'আমরা এরকম অনেক শব্দ নিজেরা বানিয়ে নিয়েছি। এগুলোকে ইন্ডিয়ান ইংলিশ বলা হচ্ছে এখন।'

'যেমন—যেমন?' উৎসাহিত হয়ে উঠল সকলে।

'যেমন ধরো— 'বেডশিট', 'ব্রেকজার্নি', 'স্লিপার কোচ'। শব্দগুলো শুনলে মনে হবে যেন এক্ষুনি প্লেনে চড়ে এসে নামল।' লাবণ্য যোগ করে চলল শব্দগুলো।

'বলেন কী এসব শব্দগুলো ইংরাজি নয়?' বুলবুল একেবারে হতভম্ব।

'শুধু এগুলো কেন? এই যে আমরা 'ওনারশিপ ফ্ল্যাট' খুঁজি, কিংবা সিনেমায় 'প্লেব্যাক সিঙ্গার' কথাটা বলি এগুলোও তো ইন্ডিয়ান ইংলিশ বা ভারতীয় ইংরাজি শব্দ।' এবার নতুন শব্দগুলো যোগ করলেন ভোলানাথ বাবু।

কালাচাঁদ বলল, 'বেশ মজার ব্যাপার তো! এই শব্দগুলো আমরাই ইংরাজিতে বানিয়ে তারপর তার বাংলা খুঁজি।'

রিমঝিম বলে, 'বেডশিট না হয় বিছানার চাদর হল, প্লে ব্যাক সিঙ্গার নয় নেপথ্য সংগীত শিল্পী হল কিন্তু ব্রেকজার্নি আর স্লিপার কোচ কী হবে বাংলায়?'

বুলবুল বলে, 'সত্যিই তো ব্রেকজার্নির বাংলা যাত্রাভঙ্গ করলে তো মানেটাই বদলে যাবে বরং ভেঙে ভেঙে যাওয়া বলা যায়।'

'বলা যায় ঠিকই, কিন্তু সেটা পাথর ভাঙা না পথ ভাঙা বলে দেওয়া ভালো।'—রিমঝিমের কথায় সবাই হেসে উঠল। রিমঝিম বলে, 'তবে স্লিপারকোচের বাংলা না থাকলেও হিন্দিতে একটা ভালো শব্দ আছে 'শয়নযান'। ওটা তো লাগানো যায়!'

সবারই বেশ ভালো লেগেছে মনে হল শব্দটা। লাবণ্য বললেন, 'এই যে আমরা আকছার বলি এস.টি.ডি.—আই.এস.ডি. আর রাস্তায় রাস্তায় দেখি পি.সি.ও এগুলোও তো আমাদের বানানো ইংরাজি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। যাকে বলে অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম। বিদেশে শুধু আই.ডি.ডি. শব্দটা চলে, আমরা তাকে আই.এস.ডি. বানিয়ে নিয়েছি। ওদের বলা ''ইন্টারন্যাশনাল ডাইরেক্ট ডায়ালিং'' আমাদের কাছে হয়ে গেছে 'ইন্টারন্যাশনাল সাবস্ক্রাইবার ডায়ালিং''। কেমন মজা বলো তো।'

ভোলানাথবাবু বললেন, 'মজাই বটে, তবে কখনো কখনো এমন অদ্ভুতভাবে আমরা মানে বদলে নিই যে মূল কথাটাই বদলে যায়। যেমন ধরো ওই যে সেদিন রিমঝিম বলল লোডশেডিংটা আড্ডায় জল ঢেলে দিল। কথাটাতে জল ঢেলে দেওয়া যদি ইংরাজি ''টু থ্রো কোল্ড ওয়াটার'' থেকে আসে তো তার মানে ছিল গায়ে পড়ে নিন্দেমন্দ করা আর এখন তার মানে বদলে দাঁড়িয়েছে হতোদ্যম করে দেওয়া।'

কালচাঁদ বলে, 'কিন্তু যদি এটা যজ্ঞের আগুনে ঘি দেওয়ার বিপরীত হয় তাহলে তো এত ঝামেলা থাকে না। আগুনে জল ঢেলে দেওয়া মানেও তো থামিয়ে দেওয়া।'

ভোলানাথবাবু বললেন, 'বেশ সোজাভাবে ভেবেছ তো, চমৎকার।'

কালাচাঁদ বলে, 'কিন্তু মুনশিজির দুষ্টুমির ব্যাপারটা কী সেটা তো জানা হল না।'

লাবণ্য বললেন, 'ওটাও একরকম ভারতীয় ইংরাজি। উনিও সেদিন লোডশেডিং আলোচনায় জল ঢেলে দেওয়ার কথা শুনে বুঝেছিলেন পরদিনের আলোচনা কোনদিকে গড়াবে। তাই তিনি ঘরের নিস্তব্ধতা বোঝাতে লিখেছিলেন 'পিনড্রপ সাইলেন্স'—ওটাও তো একটা ইন্ডিয়ান ইংলিশ। ইংরাজি অভিধানে পাওয়া যাবে না ওই চমৎকার শব্দখানা। ওটাও ওদের ভাষায় ''আমাদের দেওয়া বাণী''। আর ওই যে পরে বললেন না, 'হিমালয়ান ব্লান্ডার'। ওটাও ইংরাজি অভিধানে পাবে না—ওটাও আমাদের বানানো কিনা!'

তারার ঠিকানা

জীবন সর্দার

তারা ভরা রাত্রের আকাশ দেখে আমার মনে হয় প্রকৃতির জীবন-খাতার একটি পাতা। তারাগুলো সেই পাতায় সাজানো অক্ষর। প্রকৃতির সব রহস্য, ঐশ্বর্যের খোঁজ পাওয়া যাবে ওই পাতা পড়তে পারলে। প্রকৃতির রহস্যের যতটুকু জানা গেছে, তার চেয়েও বেশি রহস্য জমা আছে ওই তারাদের কাছে। তাই আঁতিপাতি করে তারাদের 'ঠিকানা' খোঁজার চেষ্টা চলছে। এক জীবনে কারও পক্ষে এই একটি 'পাতা' পড়ে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

কত শত বছর আগে থেকে মানুষ তারা দেখে দেখে তাদের জীবনযাপনের ইশারা ঠিক করে নিয়েছে। দিন-মাস-বছর। ছয় ঋতুর কারণ খুঁজে বার করেছে। পথ চলার 'দিক'ও ঠিক করেছে সেই প্রাচীনকালের মানুষেরা। একা একটি তারা দেখে দেখে তাদের যত না জ্ঞানের কথা মনে হয়েছে, তার চেয়েও বেশি কথা মনে হয়েছে তারার দল দেখে।

সূর্যের পরিবার কয়েকটি গ্রহ নিয়ে। তারার দলে শুধু তারাই, সূর্য-সম তারাদের নিয়ে একটি তারার দল, নাকি 'তারামণ্ডল'। যেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল। তারামণ্ডল তো একটি নয় অনেকানেক। তাদের চিনে রাখার জন্য একটি বিশেষ নাম একটি বিশেষ দলের গায়ে লাগিয়ে মানুষ খুশি। পুরান ইতিহাসের নায়ক-নায়িকা থেকে শুরু করে। পশুপাখি সব ধরনের নামের ছাপ রয়েছে এই মণ্ডলে, নয় ওই মণ্ডলে। আমাদের জ্যোতির্বিদ্যার 'বারোটি মণ্ডলের' নাম করলেই বুঝবে আমি ঠিক বলেছি কিনা। এক এক করে বলছি সিংহ, মেষ, ধনু, কন্যা, কর্কট, কুম্ভ, মৎস, মকর, মিথুন, তুলা, বৃষ, বৃশ্চিক—এদের ঠিকানা পরে খোঁজা যাবে।

তারা চেনার প্রথম পাঠ আমরা নেব তারামণ্ডল চিনে চিনে। সেই সঙ্গে দেখে নেব ওই মণ্ডলের কোন তারাটি সবচেয়ে উজ্জ্বল। তারার দলের কোন তারার কী রং। বছরের কোন সময়ে, রাতের কোন ঘণ্টায়, আকাশের কোন কোণে, ওই 'মণ্ডলের' উদয় হবে। এত সব খোঁজ খবর পেয়ে গেলে তারার ঠিকানা পাওয়া সোজা হবে। মানে, ওই মণ্ডলের অনেক কথাই মনে থাকবে। এমনি করে কোনও প্রকৃতি-পড়ুয়া যদি তারার ঠিকানা মনে রাখতে পারে, মানে, দিগন্ত থেকে কত উপরে, কোন কোণে তাকে চাওয়া মাত্র দেখা পাবে, তবে তার নিজের 'দিকচিহ্ন'ও বুঝতে পেরে যাবে। সময় কত হল, কটা বাজে এই ধারণা তার কাছে সহজে চলে আসবে।

যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গণিতই তারার ঠিকানা খুঁজতে সাহায্য করে। সংখ্যা দিয়ে তাদের শনাক্ত করা হয়। কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয় হবে পুরোনো নামে পরিচিত তারামণ্ডলের সঙ্গে। খুব অবাক লাগবে শুনতে একটা মণ্ডলের নাম ভালুক, একটি সিংহ, কোনোটি মেষ, আরেকটির নাম বৃশ্চিক। কোনো মণ্ডলের তারায় তারায় কল্পনার রেখা দিয়ে জুড়ে নামের সঙ্গে রেখা-ছবির মিল খুঁজে পাব না। তবে এমন নাম কে দিল? প্রশ্নটা আমাদের মনে জাগতেই পারে। যদি বলি কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ তারার ঠিকানা খুঁজছে, আর চেনা তারার দলকে মনের মতো একটি নাম দিয়ে আকাশে চিহ্নিত করে রেখেছে তবে ভুল হবে না। এ যুগের বিজ্ঞানীরাও প্রাচীন 'তারা খোঁজা' মানুষদের দেওয়া নামকে বাদ দিতে চাননি। এমন অষ্টআশিটি তারার দলের নাম এখন ঠিক করা রয়েছে। তাদের নাম বদল হয়নি। এমন নামের যুক্তি খুঁজে না পেলেও তারার ঠিকানা খোঁজার ইতিহাসে এত কাল আগের দেওয়া নামগুলো জায়গা হারায়নি। ১৯২২ সালে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কংগ্রেস তারামণ্ডলের পুরোনো নাম বহাল রেখে তাদের 'এলাকা' ঠিকঠাক করে দেয়।

তারার চেয়েও চাঁদ দেখা আমার প্রিয় শখ। সবদিন তাকে একরকম দেখায় না, আকাশের এক ঠিকানায় রোজ থাকে না। এটাই বড়ো কারণ। বড়ো হয়ে তারার ঠিকানা খুঁজতে দিনের পর দিন চাঁদকে নজরে রেখে দেখেছি, তার চক্কর দেবার পথে, চাঁদ একটির পর একটি তারামণ্ডলের ওপর দিয়ে নিজের লাইনে চলে যায়। পৃথিবী তো চাঁদকে নিয়েই 'সূর্য পাক' যাচ্ছে। সেই ঘোরা বাঁধা পথে। তাই বারো মাসে বারোটা তারামণ্ডল চাঁদের পিছে হাজির হয়। রাশিচক্রে এই মণ্ডলগুলির ছবিই আমরা দেখি। এক মাস

ধৈর্য ধরে চাঁদের চলার পথ নজরে রাখলে একটি রাশি চেনা হয়ে যাবে।

এমনি করে বারো মাসে বারোটি মণ্ডল চেনা হবে। তার সঙ্গে সাতাশটি তারাও চেনা হবে। কেননা, চাঁদের মাস সাতাশ দিনে, সাতাশটি তারা পার হয়। এক চাঁদ দেখায় এত পাওনা কম কী।

তবে কী আমরা আজ রাত থেকেই তারার ঠিকানা খুঁজতে শুরু করব!

গুণ মাকড়সা

অয়ন ঘোষ

বটগাছটার বড়ো পাতার ফাঁক-ফোকড় দিয়ে আসা টুকরো-টাকরা রোদে মস্ত গুণ চিহ্নটা ঝিলমিল করছিল। প্রকৃতি অঙ্ক কষেছে! পায়ে পায়ে গাছতলাটাতে হাজির হলাম।

বটের গুঁড়িতে, ছোট্ট নোনা গাছের ঝোপে সুতোর টানা পোড়েনে বিরাট জালটা ঝুলছে। আন্দাজ আড়ে-বহরে একফুট হবে। মাঝখান থেকে ছড়িয়ে পড়া আলোর ছটার মতো সুতো মিশেছে ধারের মোটা, টানা দড়িগুলোতে। মাঝের দিক থেকে গোল হয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে আঠালো সুতোটা ধার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মাঝ বরাবর মোটা সুতো ঝিরঝিরে দাগে বোনা গুণচিহ্নের মতন। ব্যাপারটার কেন্দ্রে একটা মাকড়সা বসে রয়েছে। সাদা-কালো-হলুদ ডোরায় মেশা শরীর। আটটা পা জোড়া জোড়া করে বাড়িয়ে দিয়েছে গুণচিহ্নটার বরাবর।

কাছে ঘেঁষতেই সচকিত। পায়ের ভরে শরীরটা জাল থেকে তুলে ধরল। মাথা উঁচু। নড়াচড়া থামিয়ে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ধীরে ধীরে নিজের শরীরটা ফের জালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

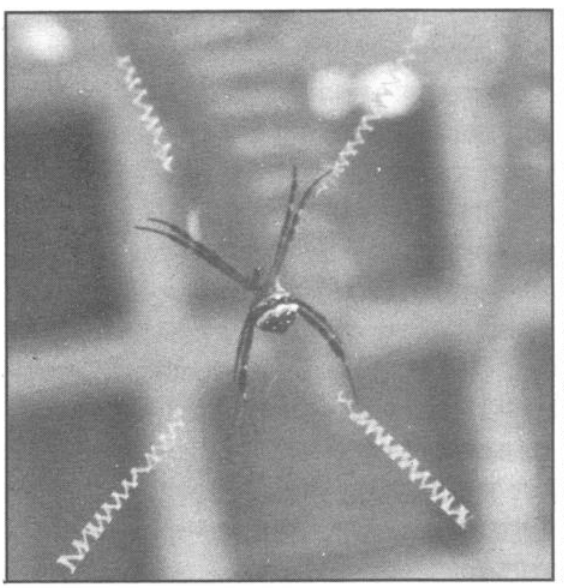

জালটা জুড়ে ছোট বড়ো নানা পোকার শুকনো শরীর। রস চুষে খাবার পর খোলসটা জালে আটকে আছে। জালের নীচের দিকে ছেলে মাকড়সাটার সন্ধান পেলাম। ছোট্ট, ধূসর রঙের মুক্তোর মত আভা শরীরে। জাল বুনে, বড়োসড়ো যে মাকড়সাটা জালের মধ্যিখানে বসে আছে ওটা মেয়ে মাকড়সা। মেঠো পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেকবার এর দেখা পেয়েছি। কিন্তু ছেলে মাকড়সা এতই ছোট চোখে পড়ে না.

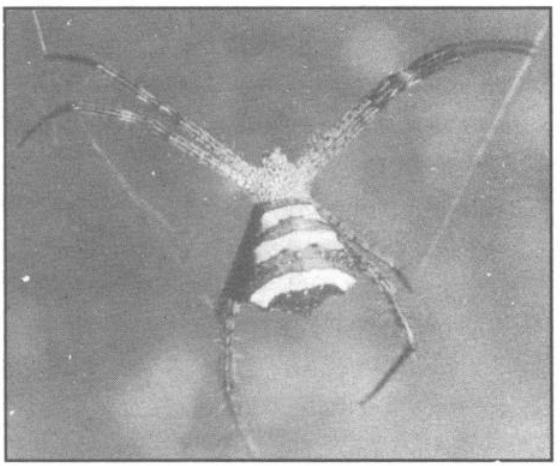

তাকে দেখলাম এই একবারই। বিজ্ঞানীরা একে 'আর্জিওপে' নামে ডাকেন। ভাবছিলাম একে 'গুণ-মাকড়সা' নামে ডাকব কিনা! ওর ওই জালের গুণচিহ্নর মতো মোটা সুতোর বুননটা, যাকে বিজ্ঞানীরা স্ট্যাবিলি মেন্টাম্ বলেন, ভেবেছিলাম ওটা বুঝি জালটা শক্ত করার জন্য। কিন্তু কম বয়সের মাকড়সাগুলোর জালে এই ব্যাপারটা বেশ বড়োসড়ো স্পষ্ট করে বোনা। অন্যদিকে বড়ো মাকড়সার নতুন বোনা জালে কখনও কখনও এই ব্যাপারটা বুনতেই দেখিনি, কখনও আধাখ্যাঁচড়া বোনা দেখেছি। কাজেই জাল শক্ত করার অনুমানটা এক্ষেত্রে টেকে না।

লুকোতে সাহায্য করে কি? তাই বা কী করে বলি, আমি তো দূর থেকে ওই গুণ-চিহ্ন দেখেই কাছে এসেছি।
তবে কি শিকারদের জালের কাছে টেনে আনার জন্য? হতে পারে মাকড়সারা তো কোনোদিন বলবে না সত্যিটা কী!

ফোটো : লেখক

শোলাশিল্প

পৃথা বল

প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত নানা দেবদেবীর মূর্তি সাজানোর জন্য রকমারি জিনিস ব্যবহৃত হয়। রং কাপড়, জরি পাট, জরির গয়না, শোলা ইত্যাদি। আধুনিককালে দুর্গাপুজোয় দেখা যায় আরও নতুন নতুন কিছু। যা দিয়ে রকমারি দুর্গার প্রতিমা তৈরি হয়েছে। বাঁশ বেত, পেতল কাঁসা তামা ব্রোঞ্জ, কাগজের মণ্ড, পাথর প্রভৃতি সবকিছুই আজকাল প্রতিমা তৈরির সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে শোলাই সবচেয়ে বেশিদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দেবী দুর্গাকে শোলার মুকুটে শোলার কাপড়ে, শোলার মালায়, এমনকি শোলার অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত করা হয়। শোলা দিয়ে এইসব শিল্পকর্ম যারা করতেন তাদের বলা হত মালাকার বা শোলারি। আর এই সাজের নাম ছিল 'ঢাকার সাজ' বা 'ঢাকেশ্বরী সাজ'। বাংলাদেশের ঢাকায় এই শিল্পের জনপ্রিয়তা বেশি ছিল বলে একসময় তা 'ঢাকার সাজ' নামেই প্রচলিত ছিল। আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন যাদুঘরে দেখেছি শোলার তৈরি নানা ধরনের জিনিস, কারুকার্য ইত্যাদি।

আমাদের হিন্দুদের বিয়ে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে বর-কনের টোপরে অপরূপ কারুকার্য করা এই শোলার মুকুট আজও শোলা শিল্পের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এছাড়া মসৃণ পাতলা শোলার ফালির উপরে আঠা লাগিয়ে শোলার ক্যানভাস তৈরি করে তাতে জলরঙে এঁকে কত কিছু কাহিনি চিত্রিত করা হয়। রামায়ণ এবং নানা ধর্মীয় কাহিনি আঁকা হয়। অনেক আগে বর্ষাকালে ভেলা তৈরির জন্য শোলার ব্যবহার ছিল। বর-কনের গাড়ি অথবা পাল্কি সাজানো হত শোলা দিয়ে। সাজানোর কাজে শোলা এক অতি প্রয়োজনীয় এবং সম্ভ্রান্ত বস্তু।

একসময় এই শোলা জন্মাত জলাভূমি, পচা খাল বিল সংলগ্ন জলামাঠে। চারা গাছের আকারে শোলা নরম ও হালকা বলে ইংরেজিতে এটি স্পঞ্জ নামে পরিচিত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে শোলার নাম Aeschynomene Aspara Lium বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শোলার চারা জন্মায়। আর অঘ্রাণ এবং পৌষ মাসে শোলা কাটা হয়। শোলা গাছ লম্বায় প্রায় দু'মিটার হয়। গাছের ডালের ব্যাস প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। শোলা গাছের কাণ্ডগুলোকে লাঠির মতো কেটে কেটে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। শুকোনোর পরে কাণ্ডের উপরকার পাতলা ছালটা খুব সহজেই তুলে ফেলা হয়। ভিতরে থাকে ধবধবে সাদা নরম শোলা। এই রকম অংশটিকে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন আকারে কেটে নেওয়া হয়। তারপর সরু মোটা ছোট বড়ো বিভিন্ন ডিজাইন করা হয়। শোলারিরা অত্যন্ত দক্ষতা এবং নিপুণতার সাহায্যে বিস্ময়করভাবে এই সাদা নরম শোলাটা কেটে ঝালর, ফুল অলঙ্কার, মাথার মুকুট, মুখোশ এবং দেবদেবীর মূর্তিও বানিয়ে থাকে। শুধুমাত্র একটা ধারালো ছুরি আর কাঁচির সাহায্যে তারা এই শিল্প কাজ করে থাকেন।

শোলার শিল্পকর্ম তৈরির জন্য তেঁতুলবীচির আঠা বাঁশ, পাঠ, সুতো, কাগজ, আর রং ব্যবহৃত হয়।

শোলা শুকিয়ে গেলে খুব সামান্য পরিমাণ জলীয় পদার্থ ধারণ করতে পারে। ফলে এটা ওজনে খুবই হালকা হয়। অতিরিক্ত তাপ, আলো এবং আর্দ্রতা শোলার পক্ষে ক্ষতিকর। তবে কাঠ, কাগজ বা অন্যান্য জিনিসের মতো শোলাতে সহজে পোকামাকড় ধরে না। ছাতাও পড়ে না। শোলার তৈরি জিনিস মজবুত নয় বরং অভিমানী। শোলার জিনিস নাড়াচাড়া বা কারুকার্য করার সময় শিল্পীকে তাই অত্যন্ত যত্নশীল হতে হয়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যে শোলার চাষ ও কারুকার্য তো হয়ই, বাংলাদেশের ঢাকা, মানিকগঞ্জ কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম এবং বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলও একসময় শোলার কাজের জন্য খ্যাত ছিল।

শোলারিরা নানাধরনের শিল্পকর্ম নিয়ে নানা উৎসবে মেলা বসাতেন। এখন এই শোলার কারুশিল্প লুপ্ত প্রায়। অপরদিকে কৃত্রিমশোলা বা Polystyrene যা স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

উত্তমদা

সুদীপ্ত নাগ

গ্রাহক সংখ্যা : ৪১০০, বয়স : ১৪

একদিন আমি স্কুলে যাচ্ছি এমন সময় দেখি আমাদের কোয়ার্টারের বাইরের যাতায়াতের গেটটা বন্ধ। ভালো করে তাকিয়ে দেখি একজন নতুন দারোয়ান এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'গেটটা বন্ধ কেন?'

'আমাদের অর্ডার আছে গেট বন্ধ রাখবার। তুমি পাশের ছোট গেট দিয়ে চলে যাও।' এভাবেই উত্তমদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। উত্তমদার ছোটোখাটো বলিষ্ঠ চেহারা, নাকটা চাপা, চোখদুটো উজ্জ্বল। ওর হাতের লাঠিটার প্রতি আমার খুব আকর্ষণ হল। একদিন আমি লাঠিটাকে ভালো করে দেখার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারছি, এমন সময় উত্তমদা আমাকে দেখতে পেয়ে বলল— 'গাল্লু, তোমার একটা লাইব্রেরি আছে না?'

'হ্যাঁ'

'আমাকে একটা স্বাধীনতা সংগ্রামের বই দেবে তো!'

আমার খুবই অবাক লাগল। হঠাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের বই চাইছে কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি স্বাধীনতা সংগ্রামের বই চাইছ কেন?'

'আমারও দেশের জন্য প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে, তাই...'

সাধারণ সাদামাটা উত্তমদা, যাকে দেখলে মনে হয় গেট খোলা গেট বন্ধ করা ছাড়া আর কিছু জানে না, তার মুখে এই কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তারপর থেকে প্রায়ই আমি উত্তমদাকে বই দিই। এইভাবে বেশ ভাব জমে গেল। একদিন আমি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কতদূর অবধি পড়েছ?'

'আমি মাধ্যমিক দিয়েছি। আমি আরও পড়তাম। জান তো, অঙ্কে আমি বেশ ভালো ছিলাম।'

'তাহলে আর পড়লে না কেন?'

'আসলে আমাদের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। আমি আর আমার ভাই স্কুলে পড়তাম। মাকে বলতাম টিফিন খাবার পয়সা দিতে। মা দিতে পারত না। তার ওপর টিউশন কী করে পড়ব? বাড়িতেও তো পড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। বাবা চাষি। তাই মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলেও আর পড়তে পারলাম না। সেই জন্যে দ্যাখো এখন বারোশো টাকা মাইনে পাই। দুশো টাকার বেশি দেশে পাঠাতেও পারি না।'

বলতে বলতে উত্তমদার চোখ ছলছল করতে লাগল। উত্তমদার ঘরটা ঘুপচি মতন। জানলা নেই। আসবাবপত্র বলতে একটা কাঠের বেঞ্চ। তার ওপরেই রাতে ঘুমোয়। একটা আলোরও ব্যবস্থা নেই। অথচ এটা ইলেকট্রিক অফিসের কোয়ার্টার। পাশেই সাব স্টেশনে আলো ঝলমল করছে। ওর জীবনটা যেন ওর ওই ঘরের মতোই অন্ধকার। আমার খুব কষ্ট হল।

একদিন আমাকে উত্তমদা বলল, 'গাল্লু, তোমার বাবা তো ইঞ্জিনিয়ার। একটা লাইট লাগিয়ে দিতে বলবে আমার

ঘরে। আমি ভাবি বাবাকে বলব, মনে থাকে না। বেচারা উত্তমদা আশা করে বসে থাকে। শেষে একদিন আমি বাবাকে কথাটা বললাম। বাবা বলল, 'ঠিক আছে, কালকেই আলো লাগানো হয়ে যাবে। আমি ছুটে উত্তমদাকে খবরটা দিতে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি উত্তমদা নেই, সেখানে একজন অন্য লোক বসে আছে। আমি বললাম, 'উত্তমদা কোথায়?'

'আগের লোক তো বদলি হয়ে গেছে। আজই সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল।'

জানি জীবনের এই নিয়ম—একজন যাবে, আরেকজন আসবে। এটাই স্বাভাবিক। তবু আমি আজও উত্তমদাকে ভুলতে পারিনি।

গ্রীষ্মের পাঁচালি

সুশ্রুত চক্রবর্তী

গ্রাহক সংখ্যা : ৪০২৮, বয়স : ৯

গ্রীষ্মকালে রৌদ্র ভীষণ,
যায়না পথে চলা,
শুকিয়ে যায় মাথার ঘিলু,
শুকিয়ে যায় গলা।

'জল-জল-জল' চারদিকেতে
উঠছে হাহাকার,
জলবিহীন ওই পুকুর-কুয়োয়
কাদাটুকুই সার।

অনির্বাণ ত্রিবেদী

গ্রাহক সংখ্যা : ৪৬৩২, বয়স : ৯

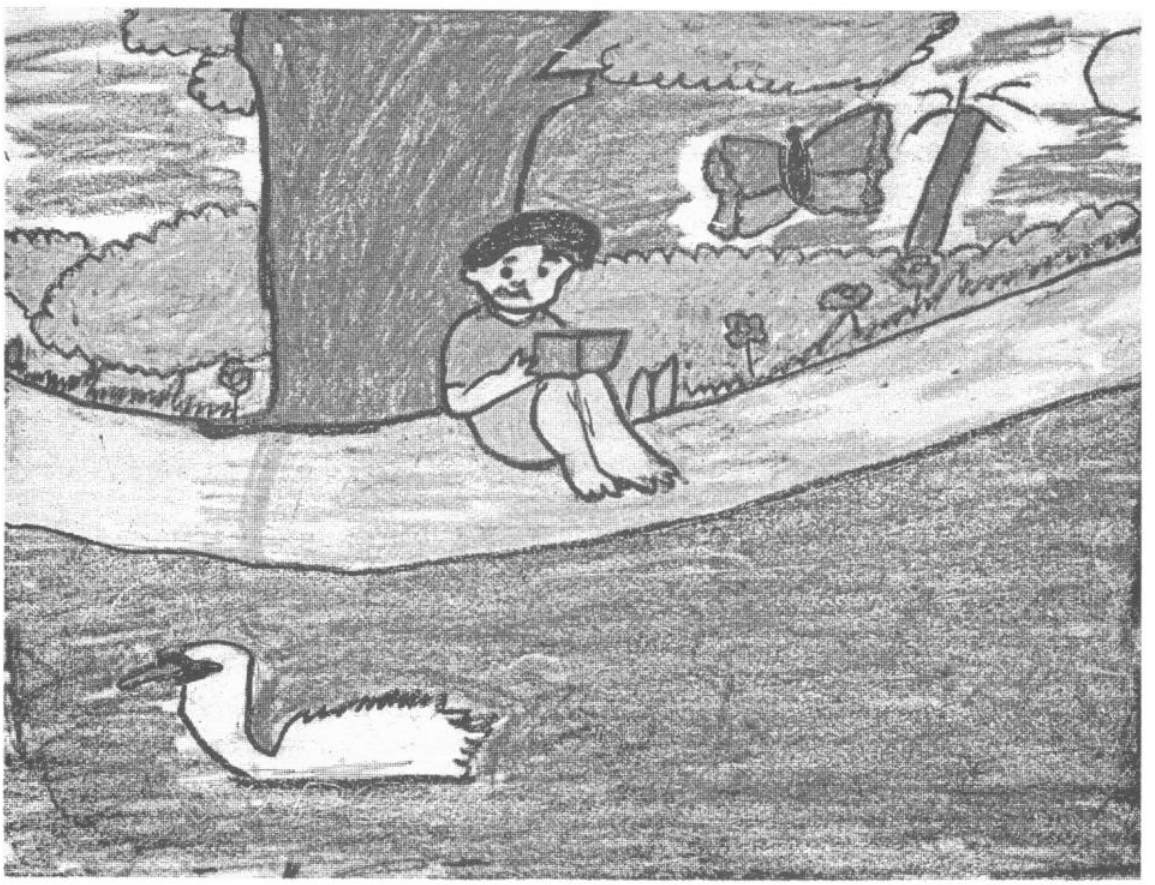

সাগ্নিক কুমার সেন

গ্রাহক সংখ্যা : ৪৭০, বয়স : ৭

পটলার দোষ-ত্রুটি

অভিষেক রায়

গ্রাহক সংখ্যা : ৪১৬৮, বয়স : ১৫

পটলার শুধু একটাই দোষ
শুধু একটাই ত্রুটি,
সরবত দিলে খেতে চায় জল;
ভাত দিলে চায় রুটি।
আম দিলে বলে আমলকি খাব;
জাম দিলে চায় জামরুল,
মৌমাছি যদি কামড়ায় ওকে
বলে, সেটা নাকি ভীমরুল।
ধনেপাতা দেখে বলে নটেশাক
জল দেখে বলে জল না,
কালীতলা যদি কভু যেতে চাও
নিয়ে যাবে তবে কালনা।
নিম বললেই নিমতলা শোনে;
আম বললেই আমতা,
ঠিকানা শুধোলে বলে পরিচয়
নামটি শুধালে নামতা।
পটলার শুধু একটাই দোষ
শুধু একটাই ত্রুটি,
শনি ও রবিতে কাজ করে খুব
সোম টু শুক্র ছুটি।

৩০০ এবং ৪০০

!!

বল বয়

এভারেস্ট শীর্ষে আরোহন করেছেন অনেকেই। তাঁদের ক'জনের নাম মনে রেখেছে পর্বতপ্রেমীরা? কিন্তু হিলারী এবং তেনজিং-এর নাম কেউ কি কোনদিন ভুলে যাবে? না। কারণ পৃথিবীর শীর্ষ বিন্দুতে প্রথম পৌছেছিলেন ওঁরা দুজনেই। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে দশ হাজার রানের গণ্ডি অতিক্রম করার পরে ভারতের সুনীল গাভাসকারও উল্লেখ করেছিলেন হিলারী এবং তেনজিং এর নাম। বলেছিলেন যে অনেকেই ভবিষ্যতে অতিক্রম করবেন দশ হাজারের বেড়া, কিন্তু পথিকৃত হিসেবে অক্ষয় থাকবে তাঁর নাম। এলান বর্ডার, স্টিভ ওয়া টপকে গেছেন সানিকে, ভবিষ্যতে এঁদের সকলকেই অতিক্রম করবেন শচীন, হয়তো লারাও, কিন্তু দশ হাজারি ক্লাবের প্রথম সদস্যের আসন থেকে গাভাসকারকে টলাতে পারবেন না কেউই।

সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে দু'দুটি 'প্রথম এভারেস্ট জয়' স্থাপিত হয়েছে। একটি ভারতীয় পর্যায়ে, অন্যটি বিশ্বপর্যায়ে। আর দুটি কীর্তির অধিকারীই আজকের দুনিয়ার দুই অন্যতম সেরা আকর্ষণীয় খেলোয়াড় বীরেন্দ্র সেওয়াগ এবং ব্রায়ান লারা।

৩০০

১৮৭৭ সালে ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। টেস্ট আঙিনায় ভারতের প্রবেশ অনেক পরে। কিন্তু তাহলেও নয় নয় করে সাতটি দশক পার করে এসেছে ভারতীয় টেস্ট দল। মনের গহিন কোণে একটি কাঁটা মাঝেমাঝেই খোঁচা দিত। গত ৭২ বছরে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড়ই যে পার করতে পারেননি তিনশো রানের সীমারেখা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের ঝুলিতে বেশ কয়েকটি তিনশো রানের ইনিংসতো রয়েছেই, এমনকি পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়েরাও এক বা একাধিক ট্রিপল সেঞ্চুরির মালিক হয়ে গেছেন। মার্চেন্ট, হাজারে, মানকড়, গাভাসকার, বিশ্বনাথ বা শচীনরা পারেননি। বছর তিনেক আগে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন লক্ষ্মণ, কিন্তু মাত্র উনিশ রানের জন্য তিনিও সেই দূর্লভ সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। অবশেষে শেষ হল আমাদের সাত দশকের প্রতীক্ষার। গত ২৯ মার্চ মুলতানের মাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ট্রিপল সেঞ্চুরি করলেন বীরেন্দ্র সেওয়াগ।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে ত্রিশত রানের অধিকারী হলেন সেহওয়াগ। কিন্তু বীরুই যে এই দুর্লভ সম্মান পাবেন সেটি কি কেউ আদৌ ভেবেছিলেন? বোধহয় না। কারণ সেহওয়াগ মানেই ঝড়, সেহওয়াগ মানেই দুরন্ত গতিতে রান তোলা, সেহওয়াগ মানেই মার মার কাট কাট, সেহওয়াগ মানেই ধৈর্যহীনতার (?) উদাহরণ। ভারতীয় দলে সেহওয়াগের অন্তর্ভূক্তি হয়েছিল এক দিবসীয় খেলোয়াড় হিসেবেই। সীমিত ওভারের দলে অভিষেক হবার বছর দুয়েক পরে টেস্ট ক্যাপ পরেছিলেন সেহওয়াগ। কিন্তু টেস্ট ম্যাচেও তাঁর খেলায় এক দিবসীয় ঢং! বিশেষজ্ঞদের কপালে ভাঁজ পড়ে ওর খেলার ধরনে। টেকনিক সংক্রান্ত বিষয়ে সেহওয়াগের সমালোচনা করলেও বিশেষজ্ঞরা বেশি মুখর ওঁর মানসিকতার। পাক সফরের আগের অস্ট্রেলিয়া সফরে একটি ইনিংসে ১৯৫ রানে দাঁড়িয়ে ছক্কা মারার লোভ সামলাতে না পেরে আউট হয়ে যাবার জন্য তামাম বিশেষজ্ঞরা সমস্বরে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু তাদের সমালোচনা সেহওয়াগের ওপর বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। মুলতানে প্রথম শতকটি সেহওয়াগ করেছেন ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে। এবং শুধু তাই নয়, তৃতীয় শতকটিও এসেছে একটি ছক্কায়। ব্র্যাডম্যান, লারা সমেত সেহওয়াগের ষোলজন পূর্বসূরির কেউই কিন্তু এমন সাহস দেখাতে পারেননি।

৪০০

সেহওয়াগের ভারতীয় ক্রিকেটে ট্রিপল সেঞ্চুরিতে পথিকৃত হবার ঠিক দু'সপ্তাহের মধ্যেই ক্রিকেট দুনিয়া তোলপাড়। সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি, ট্রিপল সেঞ্চুরি নয়, টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম কোয়াড্রুপল সেঞ্চুরি। আর এই চারশো রানের মালিক আর কেউ নয়, বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় শিরোপার অন্যতম দাবিদার, ক্রিকেটের রাজপুত্র ব্রায়ান চার্লস লারা। ১২ এপ্রিল ওন্টিগার

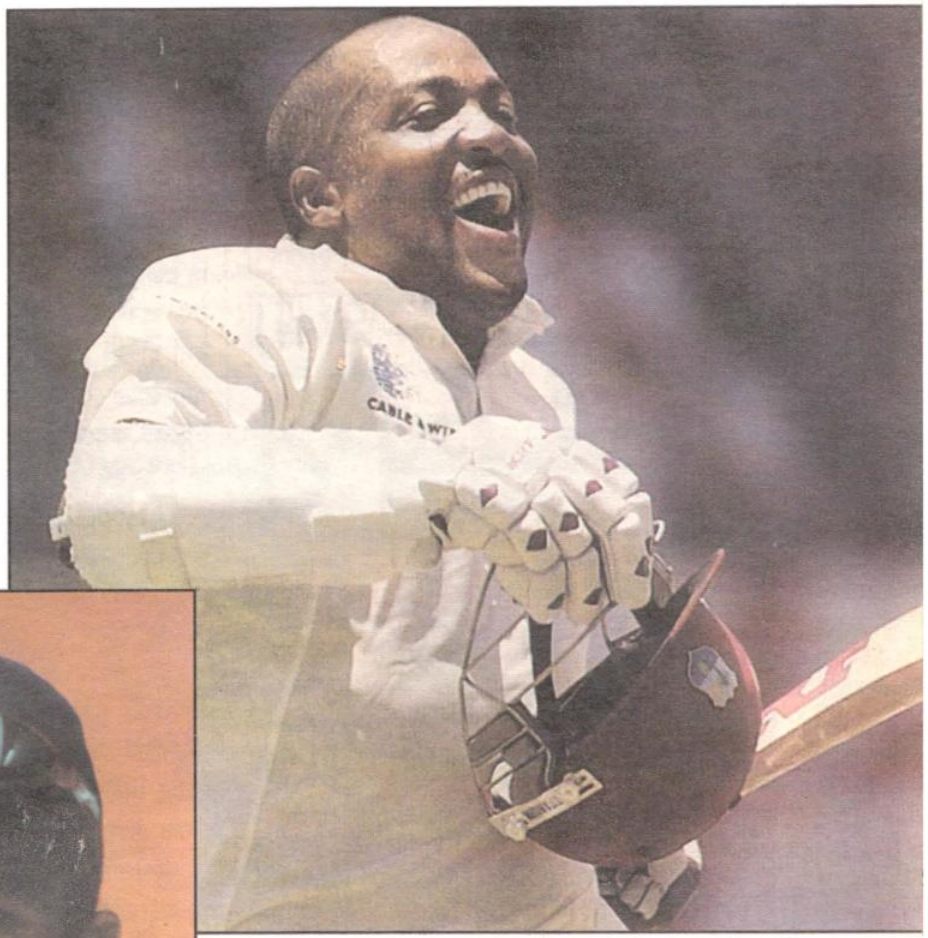

সেন্ট জনস'এর রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ তথা শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে হগার্ড, হার্মিসন, ফ্লিনটফদের তুলোধোনা করে লারা অপরাজিত থাকলেন চারশো রানে।

অ্যান্টিগা টেস্টে ৪০০ রান করে ক্রিকেট ইতিহাসে পথিকৃত হলেন লারা। কিন্তু টেস্টটা কী শুধু বিখ্যাত থাকবে ওই ৪০০ রানের জন্যই। না। এই টেস্টটা শুধুই লারার। কী করেননি লারা। ওই টেস্টে ব্র্যাডম্যানের পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে দ্বিতীয়বার অতিক্রম করেছেন তিনশো রানের সীমানা, ম্যাথু হ্যাডেনকে টপকে ফিরে পেয়েছেন এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের শিরোপা, আর এই শিরোপা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারেও লারা পথিকৃত। ১৮৭৭ সালের প্রথম টেস্ট ম্যাচেই সেঞ্চুরি করে (১৬৫) সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারম্যান। তারপর বিভিন্ন সময়ে সেই রেকর্ড ভেঙে এক এক করে শীর্ষে আসন পেতেছেন মার্ডক, ফস্টার, স্যান্ডাম, ব্র্যাডম্যান, হ্যামন্ড, হাটন এবং সোবার্স। এরা কেউ কিন্তু হরিয়ে যাওয়া আসন পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। সোর্বাসের মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছিলেন লারা, ন বছর পরে গত অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু হ্যাডেন ৩৮০ রান করে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়েছিলেন লারাকে। কিন্তু রাজপুত্র ছ'মাসের বেশি সময় দেননি হ্যাডেনকে। মুকুট আবার যথাস্থানেই শোভা পাচ্ছে।

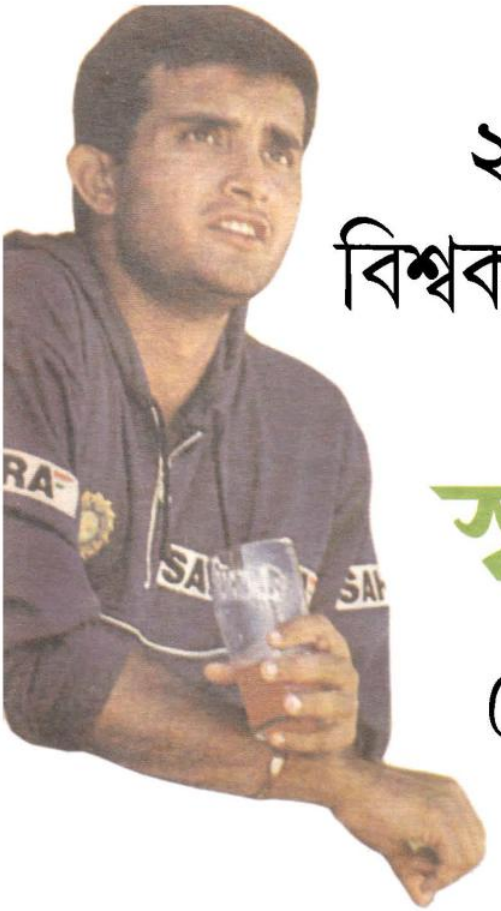

২০০৭ বিশ্বকাপের জন্য স্বপ্ন দেখাই যায়

সব্যসাচী সরকার

অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ ড্র করে ফেরার পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সামান্য হতাশ লেগেছিল। বলেছিলেন, 'একটুর জন্য সিরিজটা জেতা হল না!' সত্যিই তো, সিডনির শেষ টেস্টে ৭০৫ করেও জিততে পারেনি ভারত, বিদেশে সিরিজ জয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কে জানত, মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে পাকিস্তানে ইতিহাস গড়ে ফেলবে সৌরভের ভারত?

রাওয়ালপিন্ডিতে ১৬ এপ্রিলের দুপুরে ইতিহাস তো গড়লেনই। মহম্মদ আজহারউদ্দিনের অধিনায়ক হিসাবে ১৪টি টেস্ট জয়ের রেকর্ডও ভেঙে দিলেন সৌরভ। ৩৮টা টেস্টে অধিনায়কত্ব করে ১৫টি টেস্ট জয়ের অনন্য রেকর্ড এখন তাঁর দখলে। সেখানে ১৪টি টেস্ট জিততে আজহারের লেগেছিল ৪৭টি টেস্ট। পাকিস্তানের মাটিতে কোনও ভারতীয় দলের প্রথম সিরিজ জয় বলেই নয়, বিদেশে সিরিজ জয় হিসাবে এই জয়ের তাৎপর্যই আলাদা। সেই জন্যই সৌরভ বলেছেন, 'এর আগেও বিদেশে টেস্ট ম্যাচ জিতেছি আমরা। শ্রীলঙ্কায় জিতেছি, জিম্বাবোয়েতে জিতেছি, অস্ট্রেলিয়াতে জিতেছি, ওয়েস্ট ইন্ডিজেও জিতেছি। কিন্তু একটুর জন্য সিরিজ জেতা যায়নি। এই জন্যই এই জয়ের মূল্য আলাদা।' সত্যিই, ভারতীয় ক্রিকেটের ৭২ বছরের টেস্ট ইতিহাসে বিদেশে টেস্ট সিরিজ জয় হাতে গোনা। পাকিস্তান জয়টা ধরলে মাত্র সাতটা।

কী করে সম্ভব হল পাকিস্তান জয়? একদিনের সিরিজ জেতার পরে মুলতানে প্রথম টেস্টে সেহওয়াগ ঝড় অবশ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর। সিরিজ শুরুর আগে বলা হচ্ছিল এই সিরিজ হল ভারতের ব্যাটসম্যান বনাম পাকিস্তানি বোলারদের লড়াই। কিন্তু প্রথম টেস্টে পাটা উইকেট করতে গিয়েই ডোবে পাকিস্তান। ওই যে প্রথম দিনই সেহওয়াগ ২২৮ নট আউট করে ফেলেন, তখনই মেরুদণ্ড ভেঙে যায় পাক বোলারদের। শোয়েব আখতার বা মহম্মদ সামি-রা ত্রাস হয়ে উঠলেন কোথায়? স্রেফ গতির উপর নির্ভর করে যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উইকেট আসে না, সেটা শোয়েবরা বোঝেননি। গোটা সিরিজে দ্বিতীয় টেস্টে খেলা উমর গুলকে শুধু শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলার মনে হয়েছে। ইমরান তো বলেই ফেলেছেন, 'লাহোরে উমর গুল অত ভালো বল না করলে সিরিজের ফল ভারতের পক্ষে ৩-০ হলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।'

পাশাপাশি ভারতের এই ব্যাটিং লাইন আপ অবশ্যই এই মুহূর্তে বিশ্বসেরা হওয়ার দাবি রাখে। সেহওয়াগ-রাহুল-শচীন-লক্ষ্মণ-সৌরভ-গাভাসকার কোনও টিম এমন আছে যে এই ব্যাটিংশক্তিকে ভয় পাবে না? অতীতে ভারতের ব্যাটিং এক বা দু'জনের উপর নির্ভর করে এসেছে। দীর্ঘ সময় গাভাসকার-বিশ্বনাথ, একটা সময়ে শুধু তেন্ডুলকর। নয়ের দশকের মাঝামাঝি রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা এসে যাওয়ার পরে শচীনের উপর চাপ অনেকটাই কমে এসেছে। এখন শচীন অনেকটা খোলা মনে খেলতে পারেন। জানেন যে তিনি না পারলে রাহুল আছেন, সৌরভ আছেন।

ব্যাটিং যদি সাফল্যের একটা বড়ো কারণ হয়, ভোলা যাবে না বোলারদেরও। সবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসেছেন লক্ষ্মীপতি বালাজি ও ইরফান পাঠান। কিন্তু গোটা সিরিজে নিয়ন্ত্রিত সুইং বোলিং করে একের পর এক উইকেট কুড়িয়েছেন দু'জনে। মনে পরিয়ে দিয়েছেন কপিল দেব-প্রভাকরের জুটির কথা। মহাতারকাদের মাঝে আলাদা করে চোখে পড়েছেন পাঠান-বালাজি।

ভোলা যাবে না অধিনায়কত্বও। একটা দলের সাফল্য একদিনে আসে না। বিশ্বকাপের সময় মনোবিদ স্যাভি গর্ডনের টোটকা অনুযায়ী কাঁধে কাঁধ দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সাফল্য উপভোগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই

ট্র্যাডিশন পাকিস্তানেও চলেছে। সৌরভের নেতৃত্বে আক্ষরিক অর্থেই এই দল একটা সুখী পরিবার। টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে গিয়েছে নিজেদের প্রমাণ করার একটা তাগিদ, শৃঙ্খলাবদ্ধ আত্মবিশ্বাস আর জেতার ইচ্ছে। 'ভালো খেলিয়াও পরাজিত' এই যদি ভারতের চিরকালের স্লোগান হয়, তার বদলে এই টিমের মন্ত্র হল 'জেতা একটা অভ্যাস। সেটাকে রপ্ত করতে হবে।'

আধুনিক ক্রিকেটে ক্রিকেটাররাই শেষ কথা নয়, সব দলেরই থাকে 'সাপোর্ট স্টাফ'। নেপথ্যে যাঁরা কাজ করেন। এই দলে যেমন নীরবে কাজ করে যান কোচ জন রাইট, যাঁর বিজ্ঞানসম্মত কোচিং টিমটাকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। আছেন ফিজিও অ্যান্ড্রু লিপাস আর ট্রেনার গ্রেগরি কিং, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণণও। এঁরা না থাকলে 'টিম ইন্ডিয়া' কখনই 'টিম ইন্ডিয়া' হত না।

যাই হোক, পাকিস্তানে সিরিজ জয় এই দলকে এমন একটা আত্মবিশ্বাস এনে দেবে, যারা পরের সফরগুলোয় কাজে লাগবে। গত বছরের ২৩ মার্চ ওয়ান্ডারার্সে রিকি পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ ফাইনালে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতকে। হাতছাড়া হয়েছিল বিশ্বকাপ। সন্দেহ নেই, সৌরভ-বাহিনীর এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত ২০০৭ সালের বিশ্বকাপ। টিমের ক্রিকেটারদের গড় বয়স ৩০-এর নীচে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের নিঁখুত মিশেলই এই দলের সম্পদ। তা হলে আমরা কেন স্বপ্ন দেখব না? কেন ভাবব না ওয়েস্ট ইন্ডিজে ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে ট্রফি উঠুক এক বাঙালি অধিনায়কের হাতে? 'আমরাও পারি' বিশ্বাসটা সংক্রামক ব্যাধির মতোই গোটা দলে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন সৌরভ। আর পেরেছেন বলেই ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়কের মুকুট এখন সৌরভের মাথায়। অভিনন্দন সৌরভ। শুভেচ্ছাও, আরও সাফল্যের জন্য।

পূর্ব প্রকাশিতর পর

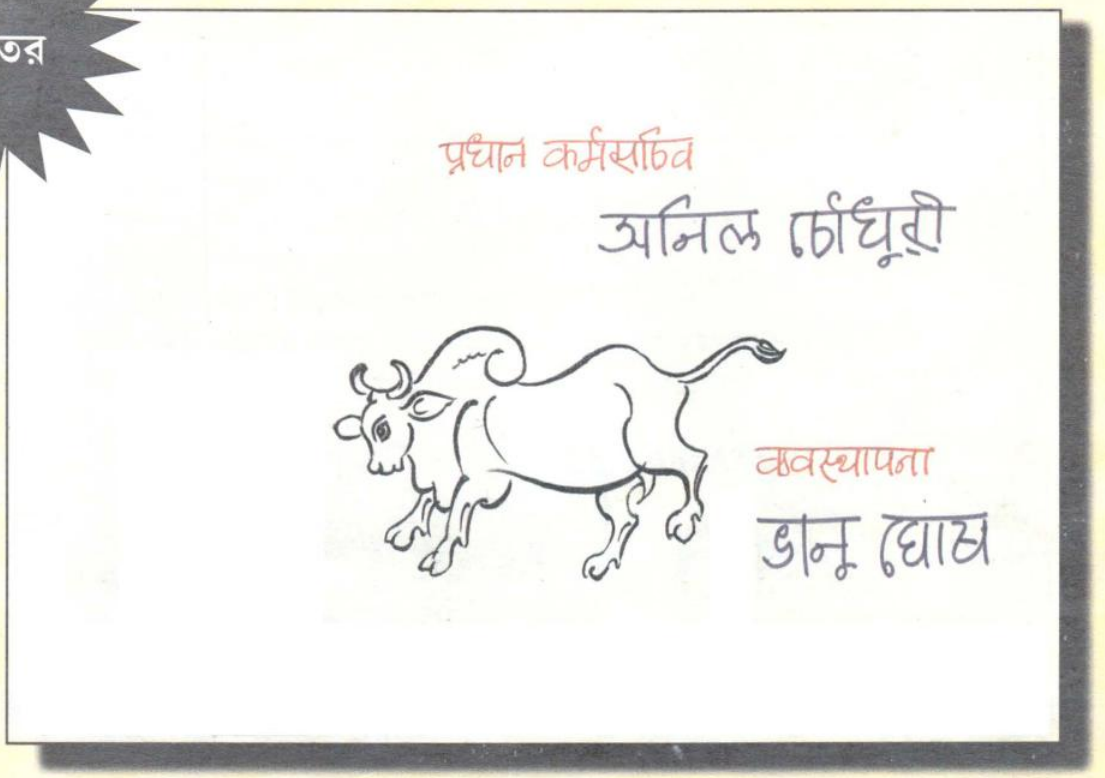

জয় বাবা ফেলুনাথ

চিত্রনাট্য : প্রথম খসড়া

CALCUTTA LODGE / MANAGER'S ROOM / MORNING

ফেলু আসতেই নিবারণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

চক্র ইনি আপনার জন্য অনেকক্ষণ wait করছেন।

অপেক্ষমান ভদ্রলোকটি হলেন ইন্‌স্পেক্টর তেওয়ারি— ফেলুকে দেখেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

তেওয়ারি Good Morning ! কেমন আছেন?

ফেলু ভালো। আপনি?

তেওয়ারি শুনলাম আপনি এখানে এসেই কাজে লেগে গেছেন?

ফেলু কী করি বলুন! আমাদের ত আর কেউ মাসে মাসে মাইনে দেবেনা, কাজেই কুড়িয়ে বাড়িয়ে—

তেওয়ারি But Mr. Mitter...

ফেলু বলুন।

তেওয়ারি hesitate করে।

তেওয়ারি আপনি কি আমার advice নেবেন?

ফেলু আগে advice টা শুনি।

তেওয়ারি আপনি মগনলালের নাম শুনেছেন ত?

ফেলু নাম কী বলছেন, তার সঙ্গে কাল দুপুরে এক ঘণ্টা কাটিয়ে এলাম যে।

চক্র সে কি মশাই, এখবর ত বলেন নি।

ফেলু আমাদের সরবৎ খাওয়ালেন, তার প্রাইভেট সার্কাসের খেলা দেখালেন!

তেওয়ারি আপনার কী impression?

ফেলু একটি অনবদ্য বিচ্ছু!

তেওয়ারি আপনি কি জানেন যে দুদিন আগে আর একটা চুরি হয়েছে বানারসে— in Mr. Badrinarayan's house —একটা নটরাজের মূর্তি— a very rare piece— আর চোরির চার দিন আগে মগনলাল সে বাড়িতে গিয়েছিলেন?

ফেলু তাহলে আর কী? ওর বাড়িতে search করুন, চোরাই মাল পেয়ে যাবেন!

তেওয়ারি মিঃ মিটার — অত বোকা লোক নেই মগনলাল!

ফেলু কি মুশকিল — তার চালাকির উপর চালাকি করাটাই ত আমার উদ্দেশ্য! — আমার বিপদের কথা ভুলে যান। আমাকে খালি বলুন প্রয়োজনে আপনাদের সাহায্য পাব কি না।

তেওয়ারি Any time, Mr. Mitter— সেতো আপনি জানেনই। এলাহাবাদেই দেখেছেন আপনি। দরকার হলে একটা টেলিফোন্— ব্যস্।

ফেলু ধন্যবাদ।

গঙ্গার ধারে কবীরের ভজন শোনা যাচ্ছে।

GHOSHAL'S COURTYARD

শশীবাবু প্রতিমার চোখ আঁকছেন। রঙ দেওয়া আর অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। ক্যামেরা দুর্গার চোখ এবং শশীবাবুর তুলি থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসে নিচের দিকে। মেঝেতে এসে পৌঁছালে দেখা গেল— গণেশের মূর্তিটা পড়ে আছে বেদীর ঠিক সামনেই— যদিও ক্যামেরা খুব কাছে না গেলে সেটা চোখে পড়ত কিনা সন্দেহ।

শশীবাবুর তুলিতে কালো রঙ ফুরিয়ে গেছে। তিনি নিচু হয়ে বাটি থেকে রং নিতে গিয়ে গণেশটা তার চোখে পড়ে। শশী সেটাকে কম্পিত হস্তে তুলে নেয়— তার দৃষ্টি বিস্ফারিত।

GANESH MAHALLA / LATE EVENING

ফেলু এণ্ড কোং পানের দোকান থেকে পান কেনে।

লাল সব কিসিমকা মসল্লা দে দেনা— আচ্ছা করকে।

ফেলু ও পান খেলে মগজের ঘিলু সব জট পাকিয়ে যাবে কিন্তু।

লাল আরে দুর মশাই- মগজ! প্লট রেডি— এখন শুধু লিখে ফেলা।

তিনজনে গলি দিয়ে হেঁটে চলেছে।

ফেলু আপনার কোনো গল্পে অ্যাফ্রিকার রাজা আছে?

লাল আছে বৈ কি!

তোপ্‌সে গোরিলার গোগ্রাস।

লাল Correct। হটেমটটদের রাজা মোবুঙ্গু।

ফেলু আপনি কি হটেমটটদের দেশে গোরিলা এনে ফেলেছেন নাকি?

লালমোহন সসংকোচে ফেলুর দিকে দেখে।

লাল এটা মশাই আমার গোড়ার দিকের বই। আপনার touch এ আসার ঢের আগে। আপনি আমার লেটেস্ট করাল কুম্ভীর পড়ে দেখুন— একটি তথ্যের ভুল পাবেন না। তপেশ বাবু— ভালো হয়নি গপ্পটা?

তোপ্‌সে দারুণ! বিশেষ করে হীরে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা।

লাল Villain— বুঝেছেন, একটি মহামূল্য diamond চুরি করে তার পোষা কুমীরের টাকরায় লুকিয়ে রেখেছে selotape দিয়ে আঁটকে ... কিরকম আইডিয়া?

ফেলু দুর্ধর্ষ।

তিনজনে হেঁটে চলে।

গলির আরেকটা অংশে দেখা যায় শশীবাবু বাড়ি ফিরছে।

বাঙালিটোলারই আরেকটা গলি।
ফেলু এণ্ড কোং এগিয়ে আসছে।

ফেলু অলি গলি চলি রাম
ফুটপাথে ধুম ধাম
কালি দিয়ে চুনকাম...

লাল একটু ধুমধাম হলে মশাই খুশিই হতুম... এ একেবারে বেজায় থমথমে।

ফেলু আপনার সাহসের stock কি ফুরিয়ে এল?

লাল মুশকিল কি জানেন? সাহস জিনিসটাত আর muscle নয়! বাগচীর বাইসেপ যমের সামনেও সাড়ে ষোলো! — সাহসের যে আবার উত্থানপতন আছে। আপনি আছেন বলে ভরসা, নইলে এই গলিতে এই রাত্তিরে? ... বা-বা!

একটা ছোরাওয়ালা হাত ফেলুদের পায়ের শব্দ পেয়ে চট্ করে পিছিয়ে আড়াল হয়ে যায়।
আবার ফেলু এণ্ড কোং-কে দেখা গেল। ফেলু একবার মাথা তুলল। রাস্তার দু-পাশের বাড়ির উপরের দিকের বারান্দাগুলো দেখা যাচ্ছে; দেখে মনে হয় বাড়িগুলোতে কোনো লোকজন নেই।

ফেলু নিঝুম নিশুতি রাতে
একা শুয়ে তেতালাতে
খালি খালি খিদে পায় কেন রে?

লাল আপনার হচ্ছে কিনা জানিনা মশাই, আমার কিন্তু feeling হচ্ছে আজ রাত্তিরে একটা কিছু ঘটবে—

তোপ্‌সে Telepathy?

লাল Telepathy। সমস্ত শিরা উপশিরায় অনুভব করছি।

ফেলু বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু
আজকে রাতে দেখবি একটা মজারু
আজকে রাতে চামচিকে আর—

একটি লোককে দেখা যায় গলির অপর প্রান্তে। সে টলছে।

লাল মজারুর আবির্ভাব। মাতলামোর আর জায়গা পেলে না— দেখেছেন?

ফেলুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়—

ফেলু চেনা বলে মনে হচ্ছে?—

হঠাৎ ফেলু উর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে যায় লোকটির দিকে— তোপ্‌সে follow করে।
লোকটি শশীবাবু। তাঁর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।
ফেলুর উপরে শশী হুমড়ি খেয়ে পড়ে— এবার দেখা যায় তার পিঠ থেকে ছুরির হাতল বেরিয়ে আছে— পাঞ্জাবী রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

শশী সি-সি-সিং—

শশী আর বলতে পারে না।

দৃশ্য ৮

POLICE HQ / HOTEL MANAGER'S ROOM / MORNING

ইনস্পেক্টর তেওয়ারি টেলিফোন করছেন ফেলুকে।

তেওয়ারি No, Mr. Mitter, শশীবাবুর murder এর সঙ্গে ঘোষাল বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। ওকে খুন করেছে ওর ছেলে— মাধব পাল।

ফেলু সে ছেলে স্বীকার করেছে?

তেওয়ারি স্বীকার এখনো করেনি। বলছে ওই টাইমে সিনেমা গিয়েছিল। সেটা কিছু না। বাপ-ছেলের মধ্যে গোলমাল অনেক দিন থেকে, ছেলে বাপকে threaten করেছে অনেকবার। ওকে দুদিন চাপ দিলেই বেরিয়ে যাবে—

ফেলু টেলিফোন রেখে দেয়। সামনে নিবারণ চক্রবর্তী বসে। ফেলুকে বেশ হতোদ্যম মনে হচ্ছে।

চক্র কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি আসার পর থেকে কাশিতে Crime Wave টা কিন্তু একটু বেড়ে গেছে। কাল চৌখাম্বাতেও একটা খুন হয়েছে।

ফেলু এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা brain wave।

ফেলু নিবারণের টেবিল থেকে Akashvani-র একটা copy তুলে নিয়ে পাতা উলটোচ্ছে।

চক্র আপনি ত আর এসব বিশ্বাস করবেন না, কাল ভোরে উঠে একটিবার ঘাটে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসুন— দেখবেন মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ফেলু যেন বেশ মনোযোগ দিয়ে আকাশবাণী পড়ছে। নিবারণ কথা বলে চলে।

চক্র আমার 30th year পর্যন্ত ওদিকটা মাড়াই নি। গ্যাস্ট্রিকে ভুগতুম— allopath, homeopath, কোবরেজ, টোট্‌কা— কিসু বাদ দিইনি— তারপর একদিন ভাবলুম দেখাই যাক্ না— ক্ষতিত নেই! পাঁচটায় উঠে দিলুম ডুব। একদিন, দুদিন, সাতদিন, দশদিন — ব্যস- completely cured! বিশ্বাসে না হয় খানিকটা হয়, সবটাত নয়।

ফেলু এখনো আকাশবাণী দেখছে।

চক্র কোনো প্রোগ্রাম খুঁজছেন?

ফেলু আখতারির গান।

চক্র আজ আছে?

ফেলু গত শনিবার থাকার কথা ছিল— লখ্‌নৌ থেকে...

ফেলু পত্রিকাটা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। ঘরে আরেকজন ভদ্রলোক এসেছেন, নিবারণ তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফেলু উঠে চলে যায়।

ROOM NO 3 / CALCUTTA LODGE / MORNING

ফেলু চিন্তিত ভাবে প্রবেশ করে। লালমোহন তার খাটে বসে আছে, তোপ্‌সে এই মাত্র স্নান করে বেরোল; সে চুল আঁচরাচ্ছে।

লাল কী হল মশাই?

ফেলু পুলিশের ধারণা শশীবাবুকে তার ছেলে খুন করেছে।

লাল যে ছেলে গোল্লায় গেছে বলছিল?

ফেলু খাটে শুয়ে পড়ে। সে গভীরভাবে চিন্তিত।

লাল শুয়ে পড়লেন যে। Breakfast খাবেন ত, না কী?

ফেলু তিনটে ব্যাপারে খট্‌কা লাগছে।

লাল তিনটে?

ফেলু শশীবাবুর সিং, অ্যাফ্রিকার রাজা আর আখতারির গান,

লাল বোঝো! চন্দ্রবিন্দুর 'চ', বেড়ালের তালব্য শ, আর রুমালের 'মা'। — কিছু বঝলে ভাই তপেশ?

তোপ্‌সে সিং ত পাঞ্জাবী পদবী হয়। আর রাজস্থানী।

লাল অথবা ষাঁড়ের শিং। সিংভূমের সিং, সিংহলের সিং, সিঙ্গাড়ার সিং—

ফেলু হঠাৎ তোপ্‌সের দিকে দৃষ্টি দেয়।

ফেলু তোপ্‌সে, অ্যাফ্রিকা বলতে তোর প্রথমেই কী মনে হয়?

তোপ্‌সে জঙ্গল।

লাল সাহারা।

ফেলু আর জঙ্গল বলতে?

তোপ্‌সে জানোয়ার।

ফেলু আর King of জানোয়ার বলতে?

তোপ্‌সে-লাল সিংহ! পশুরাজ সিংহ!

ফেলু ঠিক।

তোপ্‌সে শশীবাবু কি তাহলে সিংহ বলতে গিয়ে সিং বলেছেন—

ফেলু সেটা খুব আশ্চর্য নয়— আর শশীবাবুর সঙ্গে সিংহের ত একটা সরাসরি—

ফেলু হঠাৎ খাট থেকে উঠে পড়ে।

ফেলু তোপ্‌সে, ওঠ— উঠে পড়ুন, লালমোহনবাবু—

লাল কী ব্যাপার?

ফেলু উত্তেজিত।

ফেলু বোধহয় খেল খতম্। ঘোষালবাড়ি যেতে হবে।

লাল আর breakfast?

ফেলু পরে হবে।

(চলবে)

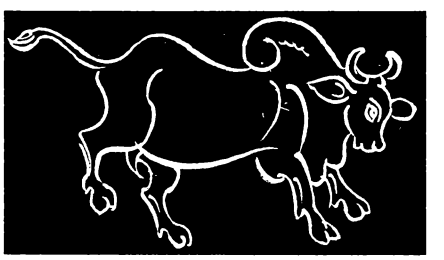

চিত্রনাট্যে পাণ্ডুলিপির বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

ফোটো : সন্দীপ রায়

অথ শ্বশ্রুগুম্ফ কথা

সুগত রায় ও বিনীতা ঘোষ

১। 'নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরী আর ময়লা'— কার গোঁফ সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে?

২। 'তাই তো বলি ল্যাংড়া আমে আঁশ কেন'— এই বিখ্যাত উক্তিটি কার এবং 'ল্যাংড়া আম'টি কি?

৩। একটি ছোট্ট আমেরিকান মেয়ের পরামর্শে এক বিখ্যাত আমেরিকান রাষ্ট্রপতি মুখ ভরাট করার জন্য দাড়ি রাখতে শুরু করেন— ইনি কে?

৪। প্রচলিত ছড়াতে কার 'গোঁফ জোড়াটি পাকা' এবং 'মাথায় কনকচাঁপা'?

৫। 'লম্বা দাড়ি চৌকিদার, বলছে হেঁকে খবরদার'— কোন বাংলা ছবির জনপ্রিয় গান?

৭। একটি পরিচিত পংক্তি 'যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কী নিয়া'— পরের পংক্তিটি কি?

৮। মঙ্গলদের দাড়ি-গোঁফ চিরতরে নির্মূল করে দিয়েছিলেন কে?

৯। একদা জনপ্রিয় গানের পংক্তি— 'মাছিকে দেখে বললে পাঁচি, আয় গোঁফ দুটো তোর চাঁচি'— কার রচনা এবং কে গেয়েছিলেন?

১১। দাড়িওয়ালা বিখ্যাত এক প্রতিভাবান মানুষকে তাঁর দাড়ি না কামানোর কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন তাঁর অনেক মূল্যবান সময় বেঁচে গেছে— তিনি কে?

১২। কার ছিল সবুজ দাড়ি?

১৩। কী লাগানোতে পরিচালক বরেন মল্লিকের মনে হল পটলবাবুর চেহারাটা খুব খুলেছে?

১৬। কঞ্জুস বুড়ো দাড়ি কামানোর খরচ বাঁচানোর জন্য কী আজব উপায় বের করেছিল?

১৮। দাড়ি সংক্রান্ত একটি বিষয়ে আছেন— প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সত্যজিৎ রায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত— এদের মধ্যে মিল কোথায়?

২০। 'আবদাড়ি চাপদাড়ি / বুলবুল চশমেদার দাড়ি'— এই দাড়ির গানটি কার লেখা এবং কোন গল্পের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর

১। শ্যামবাবুদর গয়লা ২। গোরাচাঁদ, নকল গোঁফ ৩। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন ৪। ভুঁড়ো শেয়ালি ৫। দুষ্টু মিষ্টি ৭। 'এসো দাড়ি নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা' ৮। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা ৯। সলিল চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী ১১। বার্নার্ড 'শ ১২। সাতকড়ি সাঁতরা ওরফে পুণ্ডরীক কুণ্ডু ১৩। ছোট্ট বাটারফ্লাই গোঁফ ১৬। পাখিদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দাড়িগুলো ঠুকরে নিতে। ১৮। এঁরা প্রত্যেকেই এডওয়ার্ড লিয়রের বিখ্যাত লিমেরিক 'There was an old man with a beared'-কে বিভিন্ন রূপে বাংলায় অনুবাদ করেন। ২০। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাঁচায়পাকায়

ভ্রম স্বীকার : নিম্নলিখিত পাতাগুলিতে **জ্যৈষ্ঠ ১৪১১**-র পরিবর্তে **বৈশাখ ১৪১১** ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।
পৃষ্ঠা : ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৫ ও ৬৯।

জটা পাগলার সমস্যা

পটলা নতুন সাইকেল কিনে রোজই সারা শহর দারুণ স্পিডে চক্কর দিচ্ছে। সেদিন বাজারের মোড়ে ওকে দাঁড় করিয়ে বললাম, 'ওরে শোন, স্পিড বাড়ালেই হয় নারে, আসলে দরকার হল গতির ওপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ।' ঠোঁট উল্টে পটলা বলল, 'ফুঃ, সবই আমার পায়ের মুঠোয়। আমি যেমন জোরে চালাতে পারি, তেমনি পারি আস্তেও চালাতে।' আমি বললাম, 'বটে! আচ্ছা, তুই ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার স্পিডে সাইকেল চালালে কিম্ভূতনগরে পৌঁছবি বেলা একটায়, আর ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার স্পিডে গেলে পৌঁছবি বেলা এগারোটায়। বল দেখি বেলা ঠিক বারোটায় পৌঁছতে গেলে তোর সাইকেলের স্পিড কত রাখতে হবে।'

কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু

কালাচাঁদ কতগুলি ছবি এঁকেছিল। পাগলা দাশু ঝটপট সেগুলো নকল করে নিল। হুবহু নকল। কিন্তু প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেল দেখেই বললেন, 'এ কি হে! এক একটা ছবিতে এত ভুল?' দাশু দেখল ভালো করে— তাই তো!

বাঁদিকেরটা কালাচাঁদের আঁকা। ডানদিকেরটা দাশুর, বলতে পারো, ভুলগুলি কী কী?

দাশু বলল, 'চম্মলোভীনের ধবরশং।'
প্রোফেসর বললেন, 'কাটান টকটক রেক।'
কে কী বলল বুঝলে?

উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ জুন
এপ্রিল সংখ্যার ধাঁধার উত্তর ৩০ আর ৩৯

আজকাল প্রকাশন-এর

খেলা

এখন পাক্ষিক অন্যরকম চেহারায়

দেশ-বিদেশের খেলাধুলোর খবর
তারকাদের রঙিন ব্লো-আপ।
আকর্ষণীয় ফিচার।
বিষয়-বৈচিত্র্যে অসাধারণ।

৮ টাকায় ৪৮ পাতা

Regd. NO. WB/SC-102 R.N.I. No. 12007/64 Sandesh June 2004 Rs. 12

আগামী আকর্ষণ

বন্যপ্রাণীরা কি হারিয়ে যাচ্ছে?